এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

মে - জুন ২০১৯
জুলাই - আগস্ট ২০১৯

আলো ত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, মে-আগস্ট ২০১৯

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েস্ট বেঙ্গল - এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

মনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রণব দত্ত, অলোক গুপ্ত, অরিন্দম বক্সী, অজিত দত্ত,
বিশ্বজিৎ মাইতি, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১) সম্পাদকীয় ১

২) সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে
চঞ্চল সমাজদার ৪

৩) মিডিয়া: কোন পথে
অম্লান দে ৮

৪) জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার একশো বছর
প্রণব দত্ত ১১

৫) শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর এস্টেটের ইতিবৃত্ত
বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী ১৭

৬) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২১

৭) আন্দোলন সংবাদ ২৬

৮) সমিতিগত তৎপরতা ৩০

৯) শ্রদ্ধায় স্মরণে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়
.... ৩১

১০) স্মরণ ৩৫

প্রচ্ছদ চিত্র : 'জেনোসাইড', শিল্পী : রবীন মন্ডল

সম্পাদকীয়

লড়তে হবে একসাথে

দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ক্রমে গভীর হচ্ছে। 'দেশপ্রেম'-এর বুলি আওড়ে, তথ্য পরিসংখ্যানের কারচুপি করে সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় না খুঁজে দেশের মানুষকে অন্ধ জাতীয়তাবাদের জিগিরে বুঁদ করে রেখে, বিদ্বেষমূলক রাজনীতির কানাগলিতে ঢুকিয়ে নিয়ে এক সর্বনাশের পথে হাঁটতে চাইছে দেশের সরকার। সংকটকে আড়াল করার দুশ্চেষ্টায় দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা চলছে বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলিকে খুঁচিয়ে তুলে 'গা-জোয়ারি' সমাধান সূত্র দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দেশের গণতন্ত্র', সংবিধান, মানবাধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা সবকিছুর ওপর স্টীমরোলার চালানোর দুঃসাহস প্রদর্শন করে 'ছাপান্ন ইঞ্চি' বুকের ছাতির গর্বোদ্ধত প্রচার চলেছে, সংকটাপন্ন

ভারতবাসীকে আহ্বান জানানো হচ্ছে সেই গর্বের ছটায় উদ্‌ভাসিত হতে।

কিন্তু ঘনায়মান সংকটের স্বরূপকে এইভাবে অস্বীকার করা কি সম্ভব? ভারতের অর্থব্যবস্থার যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছে সামনে আসা তথ্য পরিসংখ্যানের সূত্রে তাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে।

দেশের গাড়ি শিল্প ধুঁকছে। বিগত ৮ মাস ধরে লাগাতার সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি কমেছে। মে মাসে গাড়ি বিক্রি ২০১৮ সালের মে মাসের তুলনায় ২০ শতাংশের বেশি কমে যায়। একই রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে স্কুটার মোটর-সাইকেলের মতন দু-চাকার যানের ক্ষেত্রে। ২৮৬টি গাড়ি ডিলার বিগত দেড় বছরে বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, শুধুমাত্র গাড়ি ডিলার ক্ষেত্রে ২ লক্ষের মতন মানুষ চাকুরি হারিয়েছেন। আবার ভারতের বড়ো বড়ো গাড়ি কোম্পানি যেমন মারুতি, মাহিন্দ্রা, টাটা তাদের কারখানা কয়েকদিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন কারণ গাড়ি বিক্রি হচ্ছেনা। অটোমোবাইল শিল্পের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছায়াপাত ঘটেছে ঘনায়মান সংকটের। দেশে আভ্যন্তরীন বিমানযাত্রীদের সংখ্যা বিগত ৬ মাস ধরে লাগাতার কমছে। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ডাবর, হিন্দুস্থান লিভারের মত অগ্রগন্য সংস্থা তাদের রিপোর্টে জানাচ্ছে যে তাদের বিক্রি এবং মুনাফা ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। রেলের পণ্য চলাচল বিগত পাঁচ বছরের গড়ের তুলনায় কমে গিয়েছে। আবাসন ও নির্মান শিল্পের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ চিত্র উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রথম সারির ৩০টি শহরে মোট ১২.৭৬ লক্ষ বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রি না হয়ে ফাঁকা পড়ে রয়েছে যা বিগত কয়েক বছরে সর্বোচ্চ। বিস্কুট উৎপাদক পার্লে সংস্থা পাঁচ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট ও বিক্রি না হওয়ার কারণে ৮/১০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করতে হতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন শিল্পে যে মন্দাবস্থা দেখা দিচ্ছে তা সার্বিক ভাবে দেশের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বা জিডিপি-র ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। জিডিপ-র বৃদ্ধির হার বিগত পাঁচটি ত্রৈমাসিকে লাগাতার কমে জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে ৫.৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। একইসঙ্গে কমেছে রপ্তানির বৃদ্ধির হার, বিনিয়োগের হার, পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার বা শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার। কৃষি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে দেশের অর্থব্যবস্থা এখন এক সার্বিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘতম বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বুকে এই সংকট ঘনীভূত করেছে সরকারের ভ্রান্তনীতি। আর্থিক পুঁজিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সরকারের বাজেট ঘাটতি বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই সরকারি খরচ বা বিনিয়োগ বাড়ানো হয়নি, বরং তা' নানাভাবে কমানো হয়েছে। আবার নোটবাতিল বা জি এস টি লাগু করার নীতি জনগণ তথা ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্র বিপুল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে কমেছে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা। এই ক্রয়ক্ষমতা কমার ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা কমেছে। পণ্যের চাহিদা কমায় পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করারর ঝুঁকি নিতে রাজি হচ্ছে না। তাই বিনিয়োগও বাড়েনি। একদিকে রপ্তানি কমে যাওয়া এবং অন্যদিকে বাকি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার না বাড়ার দরুণ সার্বিকভাবে অর্থব্যবস্থায় কমেছে বৃদ্ধির হার।

এই পরিস্থিতি থেকে উৎরোনোর জন্য সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রথমত, বাজেট ঘাটতি বাড়িয়ে বা বাড়তি কর আদায় করে সরকারি খরচ বাড়াতে হবে, যা' মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবে, যার মাধ্যমে বাড়তে পারে বিভিন্ন পন্যের চাহিদা ও উৎপাদন। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক এবং অ-ব্যাঙ্ক শিল্পে যে অনাদায়ী ঋণের সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করতে হবে, ব্যাঙ্কগুলিকে অনাদায়ী ঋণের টাকা ঋণখেলাপী কর্পোরেট 'রাঘব বোয়াল'দের হাত থেকে উদ্ধারের কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু সরকারের চিন্তা ভাবনায় এসব কোন কিছুরই স্থান নেই। তারা ভাবছে বৈদেশিক ও দেশীয় পুঁজিকে বিভিন্ন প্রকারের কর ছাড় ও অন্যান্য প্রণোদনা দিলেই অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ বাড়বে। কিন্তু বাড়তি সুবিধা পেলেও বাজার সম্প্রসারিত না হলে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে উৎপাদনক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করবেন না। বিনিয়োগ বাড়ানোর দায়িত্ব তাই সরকারকেই নিতে হবে। কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা', বস্তুতঃ সরকার এই সংকটকেই 'অস্বীকার' করতে চাইছেন তারা আপাততঃ দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির তোষণ এবং ভজনায় মন'প্রাণ সমর্পন করেছেন, দেশের গরিষ্ঠাংশ মানুষের স্বার্থের ব্যাপারে তারা উদাসীন। বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাকার জনজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলিকে পাশে সরিয়ে রেখে, ভুলিয়ে দিতে চেয়ে আপাততঃ দেশের শাসককুল মনোনিবেশ করেছেন তথাকথিত 'দেশপ্রেম'-এর শিক্ষাবিস্তারে, একমাত্রিক 'হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্থান' ভাবনায় সকলকে দীক্ষিত করে তুলতে। ভিন্নস্বরের প্রতি অসহিষ্ণুতার নিদর্শনস্বরূপ অন্য যে কোন মতামত প্রকাশের অধিকারকে এরা 'দেশদ্রোহিতা' বলে চিহ্নিত করতে চান। কর্তৃত্ববাদী অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার এই রাজনীতির 'ফ্যাসিস্ট' চরিত্রলক্ষণ তাই ক্রমেই ফুটে বেরোচ্ছে ইউ এপিএ আইনের 'দানবীয়' সংশোধনী, কাশ্মীরের জনগণকে কার্যতঃ অবরুদ্ধ করে রেখে সংবিধানের ৩৭০ ধারায় বিলোপ, তথ্যের অধিকার আইনকে দুর্বল করে তোলা - এইরকম একের পর এক আঘাত নামিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় জনগণ, মেহনতী মানুষ গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং জীবন-জীবিকার উপর নেমে আসা এই আক্রমণ মুখ বুঁজে স্বীকার করবেন না, জীবনের পথচলার অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই করে গড়ে তুলবেন যথার্থ প্রতিরোধ একথা আমরা যেমন বিশ্বাস করি ঠিক তেমনি আমাদের পরিসরের সমস্ত লড়াই আন্দোলন পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই অন্তবস্তুকে চেতনায় ধারণ করেই সঠিক লক্ষ্যে ধাবিত হতে চাই। এক্ষণে, দেশবাসীর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই, সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াই সর্বোপরি দেশের সংবিধান, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই একই সমতলে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই ঐক্য ও সংগ্রামের বাতাবরণে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে তাদের গ্রথিত করেই সঠিক নীতি অভিমুখে তাকে পরিচালিত করতে পারাই - এই সময়ের চ্যালেঞ্জ।

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন অভিমুখে

চঞ্চল সমাজদার

আগামী জানুয়ারী, ২০২০ শিলিগুড়িতে আমাদের প্রিয় সংগঠনের সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২০১৪ সালে জলপাইগুড়িতে রাজ্য সম্মেলনের পর বিগত দুটি রাজ্য সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্যদের চাহিদা ছিল এবার কলকাতার বাইরে কোথাও সম্মেলন করার। দার্জিলিং জেলা কমিটি যথেষ্ট সাহসে ভর করেই আগামী সম্মেলনের দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছে।

পালা-পার্বণ নয়, রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চকে আমরা ধারাবাহিক লড়াই সংগ্রামের সর্বোচ্চ মঞ্চ হিসাবেই দেখি। তাই বিগত সম্মেলনের পরবর্তী সময়ের পর্যালোচনা ও আগামীদিনের পথ চলার দিক নির্দেশিকা চূড়ান্ত করতে হবে এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই। এই সময়কালে পরিস্থিতির পরিবর্তন, বকেয়া ডি.এ, পে-কমিশন, ক্যাডারগত দাবীদাওয়া, আমলাতান্ত্রিক আক্রমণ, আমাদের অফিসগুলিতে দুষ্কৃতীদের তান্ডব, ক্যাডার ঐক্য, যৌথ আন্দোলন, ক্যাডারের অন্যান্য সংগঠনগুলির ভূমিকা, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে, এবং সর্বোপরি উল্লিখিত বিষয়গুলিতে সংগঠন তথা সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের ভূমিকার গঠনমূলন পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে হাজির হবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঃ

বিগত লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান শাসকদল ২য় বারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে আসীন হয়েছেন। সর্ব স্তরের সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় বিভাজন। অভুক্ত মানুষও তার দুর্দশার কারণ খোঁজার আগে নিজের ধর্মীয়/জাতিসত্ত্বাকে প্রাধান্য দিচ্ছে ভোট প্রদানের সময়। এইরূপ চিন্তা ভাবনা তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে মিডিয়া। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চস্তর থেকে সর্বনিম্নস্তর অবধি একদলীয় আধিপত্যবাদ কায়েম হয়েছে। সংবিধান আক্রান্ত। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিদিন সংকুচিত হচ্ছে। আর্থিক নীতির বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সংখ্যালঘুর মৌলবাদ সমান বিপদরূপে দেখা দিয়েছে। শ্রেনী সচেতনতা গড়ে তোলা ও শ্রেণী আন্দোলন ভিন্ন এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আস্থা ঃ

বিগত ৭/৮ বছর যাবৎ কেবলমাত্র সঠিক সময়ে ডি.এ অপ্রাপ্তির কারণে কয়েক লক্ষ টাকা কর্মচারীদের চিরতরে মার গেছে। অতি সম্প্রতি SAT এর রায়ে দেখা যাচ্ছে একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর বকেয়া ডি.এ-র পরিমাণ দুই লক্ষাধিক টাকা। এই রায় আদৌ মান্যতা পাবে বলে মনে হয় না। পে-কমিশন-এর মেয়াদ বাড়তে বাড়তে প্রায় চার বছর হতে

চলল। আদৌ কমিশন দিনের আলো দেখবে কিনা, বা দেখলেও কতটুকু, প্রাপ্তি হবে তা নিয়ে কর্মচারীর সন্দিহান। প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তর থেকে প্রচার চলছে আমাদের ডি.এ বা পে-কমিশন দিলে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন থমকে যাবে। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ জনপ্রতিনিধিদের বেতন বছর বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ার কি সরকারী কর্মচারীদের বাদ দিয়ে হচ্ছে ? অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তে সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দকে বদলী করা হচ্ছে। এক অসহনীর অবস্থার মধ্যে পড়েছে সমগ্র কর্মচারীসমাজ।

ক্যাডারগত দাবীদাওয়া প্রসঙ্গ ঃ

বিগত বছরগুলিতে ক্যাডারদের নিজস্ব কোনো দাবীদাওয়া অর্জিত হয়নি। উপরন্তু WBCS (Exe.)-এ Feeder হিসাবে যাওয়ার Quata কমে গেছে, আমরা একক প্রচেষ্টায় এই সর্বনাশ ঠেকাতে পারিনি। অন্য দুটো সমিতিকে লিখিতভাবে যৌথ আন্দোলনে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। ৫ম বেতন কমিশনের সুফল এবং একইসঙ্গে RO ও SRO-II দের Scale upliftment এর জন্য এখনও আমাদের Pay packet যথেষ্ট স্ফীত। তাই কি ক্যাডারের মানুষদের মধ্যে লড়াই আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীনতা কাজ করছে ?

বিভাগীয় সার্ভিস গঠন সম্পর্কে আমরা Memorandum দিয়েছি ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের কাছে যা প্রায় ৫ম বেতন কমিশনে প্রদত্ত Memorandum এর অনুরূপ। লক্ষনীয় যে অপর দুটি সংগঠনও প্রায় আমাদের অনুরূপ দাবীসনদ ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে জমা করেছে। সার্ভিস গঠনের Structure বুঝতে ওঁদের ১০ বছর লেগে গেল। বিগত ৩/৪ বছর যাবৎ অপর দুটি সমিতি দাবী করে আসছে তাঁদের 'একক' প্রচেষ্টাতে Service হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরই পঞ্জিকার মতো তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে কয়েকটা শুভসময়-এর কথা আমরা শুনতে পাই। কিন্তু এখনো কপালে শিকে ছেঁড়েনি। যদিও আমরা পুনরায় অতি সম্প্রতি এবিষয়ে অগ্রগতির জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেছি।

WBSLRs Gr-I প্রসঙ্গে ঃ

বিগত দিনে আমরা দীর্ঘকাল ROদের 'C' group-র সর্বোচ্চ বেতনক্রম দিতে হবে বলে লড়াই করেছি এবং ROদের Scale পর্যায়ক্রমে ১০ থেকে ১২ এবং সর্বশেষ ২০০৮ সালে ১২ থেকে ১৪নং-এ উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের সংগঠনের সর্বাত্মক ও একক প্রচেষ্টায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ROদের ১৪নং বেতনক্রম কার্যকর হয়েছে ০১/০১/৯৬ অর্থাৎ ৪র্থ বেতন কমিশনের দিন থেকে। এই অভাবনীয় সাফল্য বর্তমান প্রজন্মের নবাগত WBSLRsদের কাছে প্রচার করা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে 'C' groupএ একটি ক্যাডারের বেতনক্রম ১৫ নং করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে ROদের 'C' group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং Scale এর দাবী জানিয়েছি। আমার মনে হয় বর্তমানে এই

দাবী নিয়ে ক্যাডার সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই দাবী অর্জনের জন্য সর্ব্বোচ্চ স্তরের লড়াই আন্দোলন করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই দাবী আদায় হলেই আমরা MCAS এর কল্যাণে ১৮নং Scale অবধি পৌছতে পারব। ক্যাডারবন্ধুদের অনুরোধ করব বিষয়টি গবীরভাবে বিবেচনা করার জন্য।

আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা ও জনপরিষেবা ঃ

বিভাগের সমস্ত অফিসগুলিতে gr-c, gr-D, R-I, Amin, BS সহ সমস্ত কর্মচারীর সংখ্যা Sanctioned Strength এক অর্ধেকেরও কম। কিছু Re-employed ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দিয়ে ঠেকা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কাজের নির্দেশিকা নামানো হচ্ছে। কাজের বোঝা ক্রমশঃ বাড়ছে। এমনকি নির্বাচনসহ অন্যান্য Extra-departmental কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে। E-Bhuchitra এ মূলতঃ Link সহ অন্যান্য সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে পর্যাপ্ত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তৃণমূলস্তরে কাজের জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ আমলাদের অবাস্তব ফরমান। শনি, রবি ও ছুটির দিনেও অফিস খুলে কাজ করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। ৮ ঘন্টার কাজের লড়াই আজ ইতিহাস। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সমস্ত জটিলতার দায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে মূলতঃ ব্লকস্তরের আধিকারিকদের ঘাড়ে। আমরা বিগত দিনগুলিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে একাধিক পত্র প্রেরণ করেছি।

Transfer, Posting, Promotion, ACR ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েও টালবাহানা এবং স্বেচ্ছাচার চলছে। আমরা বারংবার দাবী করে আসছি Transfer Policy অনুযায়ী Transfer Posting করানোর জন্য। আমলাতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা হল Policy লঙ্ঘন করা। ব্যক্তি পছন্দ, প্রভাবশালীদের সুপারিশ এমনকি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বর্তমানে Transfer Posting এর প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। এই বিপজ্জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে রুখে দাঁড়াতে হবে।

দুষ্কৃতী হামলা ও শারীরিক আক্রমন ঃ

বিগত বছরগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে নানা অছিলায় মূলতঃ ব্লক অফিসগুলিতে দুস্কৃতীরা হামলা করছে। বেআইনী কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ। মাটি-বালির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চাপ ইত্যাদি নানা কারণে আক্রমণগুলি ঘটছিল। এমনকি আধিকারিকদের শারীরিকভাবেও আক্রমণ করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চস্তর থেকে মূলতঃ বি.এল.আর.ও দের 'চোর' এবং অফিসগুলিকে ঘুঘুর বাসা বলে দাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা লক্ষ্য করলাম আক্রমণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেল। Silver lining হল আক্রমনকারীরা সমিতির নাম জিজ্ঞাসা করে আক্রমণ করছে না। সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডার এর মানুষ আক্রান্ত। আমরা প্রতিটি ঘটনাতেই সাধ্যমতে প্রতিবাদ করেছি। আনন্দের কথা হলো অপর ২টি সমিতি কোনো প্রতিবাদ না করলেও তাঁদের অনুগামীদের একাংশ আমাদের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীদিনে যেখানেই আক্রমণ হোক আমরা প্রতিবাদ করবো, এমনকি তিনি অন্য সমিতির সদস্য হলেও।

যৌথ আন্দোলন ও ক্যাডার ঐক্য ঃ

বিগত অধ্যায়গুলিতে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি সেইগুলো নিয়ে ক্যাডার এর একাংশের মানুষের মধ্যে যৌথ আন্দোলন অর্থাৎ সমিতিগুলিকে একসাথে আন্দোলন করার একটা চাহিদা রয়েছে। আমরা এই চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে এবং পরিস্থিতিগত দাবী মেনে যৌথ আন্দোলনের একাধিক প্রচেষ্টা বিগত দিনে করেছি সে কথা আপনারা সবিশেষ অবগত আছেন। নিদেনপক্ষে ক্যাডারস্বার্থে দু/একটি Common agenda নিয়েও এগোনোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অন্যদের তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে কোন তারা সাড়া দিচ্ছেন না। যেখানে আক্রমণ সমগ্র ক্যাডারের উপর, যখন আমরা সংগঠন নির্বিশেষে সমস্যায় জর্জরিত তখন আমরা অন্ততঃ ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন একসাথে করতে পারব না কেন? তাহলে কি সমস্যাটা অন্য কোথাও, সেটা প্রকাশ্যে তাঁরা হয়তো বলতে পারছেন না।

এ প্রসঙ্গে আমার ভাবনাটা বলি। দীর্ঘদিন ধরেই কারণে অকারণে আমাদের গায়ে সরকার বিরোধী তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। এমনকি একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। মূলত নব্য প্রজন্মের ক্যাডার বন্ধুদের কাছে এই বক্তব্য পৌঁছে দিয়ে পরোক্ষে আমাদের সংগঠনে যোগদান না করার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। বাস্তবতা হলো দুস্কৃতীদের আক্রমণই হোক বা আমলাতান্ত্রিক আক্রমণ কোনোটাই কেবলমাত্র আমাদের সদস্যদের উপর নামছে না। সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডারবন্ধুরা আক্রান্ত। এখন ডি.এ, পে কমিশনের দাবী বা ক্যাডারের সার্ভিসের দাবী বা অন্যান্য বহুমুখী আক্রমণ যা আমাদের ক্যাডারের উপর নেমে আসছে তার প্রতিবাদ করলেই যদি সরকার বিরোধিতা হয় তা হলে আমরা নিরূপায়। সমস্যাগুলি কেবলমাত্র কতিপয় আমলার তৈরী নয়। নিয়োগকর্তার ইচ্ছা, নির্দেশ বা দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকে এ সকল ঘটনা ঘটতে পারে না। তাই লড়াই আন্দোলনের অভিমুখ কোন দিকে হবে তা সহজেই অনুমেয়। সম্ভবতঃ এ কারণেই অপর দুটি সমিতির যৌথ আন্দোলনে অনীহা। তাহলে আপনারাই বুঝে নিন দলীয় রাজনীতি কারা করছেন, কারা আন্দোলনের অভিমুখকে ভুল দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কারা কাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন? আমরা সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্নের শপথেই অবিচল আছি — "সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তার রূপায়ণ এর জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। কিন্তু মানুষের স্বার্থবিরোধী বা কর্মচারী বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করব"। বিগত বছরগুলিতে এই শপথ পালনের লক্ষ্যে আমরা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধুগণ, আগামী ৩১শে আগষ্ট মৌলালী যুবকেন্দ্র সাক্ষী থাকুক সমিতির ইতিহাসে Milestone হিসাবে। সেখান থেকেই রচিত হবে আগামী দিনের লড়াই এর রূপরেখা যা চূড়ান্ত রূপ নেবে আগামী রাজ্য সম্মেলনে। জাত-পাত-ধর্ম-পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতিকে পরাস্ত করে নিজেদের পরিসরে ক্যাডার ঐক্যকে সংহত করা ও সেই ঐক্যকে কর্মচারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রসারিত করা -এটাই আজকের সময়ের চাহিদা। এই স্লোগানেই মুখরিত হোক আগামী রাজ্য সম্মেলন।

মিডিয়া: কোন পথে

অম্লান দে

"When they were asked to bend they crawled" -এ দেশের সাংবাদিকদের সম্পর্কে জরুরি অবস্থায় জেল খাটা সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের বিখ্যাত উক্তি। শুধুমাত্র এই রাজ্যের বা এ দেশের নয় সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের মিডিয়ার সম্পর্কে এই উক্তি আজ ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বদলে যাওয়া প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের আবির্ভাব যেমন তথ্যভাণ্ডারকে আরো উন্মুক্ত করছে তেমনি নিপুণভাবে সেই গণমাধ্যম এবং গণজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক এবং কর্পোরেটে পুঁজির স্বার্থে। যে মিডিয়ার মূল কাজ ছিল ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা সেই মিডিয়া আজ কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে থেকে অনুসারী রাজনৈতিক শক্তির আজ্ঞাবহ। গণমাধ্যম এখন কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে থেকে নির্লজ্জ ভাবে নিরেপক্ষতা বিসর্জিত এক গণজ্ঞাপন সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। "Fourth Pillar" থেকে দ্রুত, তার নাম হয়ে যাচ্ছে "Presstitute" কিন্তু কেন?

"Western societies have allowed the private sector to own most media of communication, and have allowed those media properties to become large and more powerful than the average citizen. In allowing such corporations to serve facilitators of the free flow of information by gathering organising. Producing and distributing it for profit..."

সমাজতাত্ত্বিক রাওল্যাণ্ড লোরিমার বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিতে তথ্য মুক্তপ্রবাহ বাজারিকরণের পথে কি ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তা উপরিউক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এই বাজারিকরণ কি কোন স্বাভাবিক বিবর্তন? না, বরং একদিকে শিল্পোন্নত বিশ্বের কৌলিন্য সংকটের খবর তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত হওয়া প্রশ্নে মর্যাদাহানির আশঙ্কা, অন্যদিকে সারা বিশ্বব্যাপী তথ্যচক্রের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রন করে অর্থাৎ সোজা কথার ব্যবসা। এই দুই বাজার কূটনীতির তত্ত্বের মাঝে শুরু তথ্যপ্রবাহের নিয়ন্ত্রন-ই নয় বরং তথ্যবিষয়ের নিয়ন্ত্রন ও ক্ষমতাশালী বিশ্ব পূর্ণমাত্রায় করে চলেছে। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির সাথে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে সংবাদের চিরাচরিত Proximity বা নৈকট্যের সম্বন্ধে ধারণা। বহুজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলির প্রভাবের সাথে সাথে ধারণাগুলি বিবর্তিত হচ্ছে, তীব্রভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ-যে সংস্কৃতির নির্মাণ হচ্ছে বিশ্বায়নের হাত ধরেই। তৃতীয় বিশ্বের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে সংবাদ জগতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এখন বহুজাতিক শিল্প কর্পোরেশনগুলির মুষ্টিতে আবদ্ধ এবং তার প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বেও নয়া সাংস্কৃতিক পরিসীমা এবং মাত্রার বৈচিত্রকরণ ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। এই বৈচিত্রকরণ প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের চিরায়ত সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ ভাঙন এবং সার্বিক পরিবর্তন এনেছে, জেমসলালের মতো জ্ঞাপনতাত্ত্বিক যাকে সংস্কৃতির উত্তর আধুনিকতা বলেছেন।

ভারতীয় মিডিয়া-র বর্তমান রূপটিও কিন্তু বিবর্তিত হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভের শিরোপা নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল তার - কিন্তু উদারনীতিবাদ সেই চলার পথ ও গতি উভয়ই পরিবর্তন করে দিয়েছে। বৈভব চক্রবর্তী তাঁর "Role of Media in Indian democracy" নামক আর্টিকেলে বলেছেন- "The credibility of Indian Media is fast eroding, as the country's media has been critized time and again by the world audience for its sensationalism. The way Indian media manipulates the news and protrays the information in twisted manner has seen the country drop three place in the recent World Press Freedom Index".

বহুজাতিক পুঁজি যেমন এর নেপথ্যে আছে তেমনই উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং অসহিষ্ণুতার পারদ চড়ার ঘটনাও আছে, গৌরী লঙ্কেশদের কথা আশাকরি পাঠক ভুলে যান নি। অথচ গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য মিডিয়ার স্বাধীনতা ও শিরদাঁড়া সোজা রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ডঃ আম্বেদকর মুক্ত মিডিয়ার জন্য পৃথক সংস্থান সংবিধানে রাখার বিরোধী ছিলেন বরং তাঁর যুক্তি ছিল - "The press is merely another way of stating an individual or a citizen" তাই বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মহত্তর ভাবনা নিয়েই মিডিয়ার স্বাধীনতা জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় গণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়েছিল। অসহিষ্ণুতা তখন অবশ্য বর্তমানের মতো মাত্রা ছাড়ায়নি, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণকে দেশদ্রোহীতার মোড়কে মুড়ে দেওয়া সহজ হয়নি এত। যে অবস্থা বা স্বাধীনতার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিয়েছিল মিডিয়া যদিও আদর্শগত কারণে কিছু সংবাদ সংস্থা যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সোচ্চার সমর্থন করেছেন সেরকম দিনের পর দিন অর্ধসত্য বা অসত্য সংবাদকে আপাত সত্য হিসাবে বিক্রি করেছেন এবং এখনও করছেন। প্রিন্ট মিডিয়ার থেকে বেশি কার্যকর এখন ইলেকট্রনিক বা সোশ্যাল মিডিয়া, সেখানেও কিন্তু তারা উপস্থিত কারণ প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে যে মঞ্চ তৈরী হচ্ছে সেখানে প্রবেশের অধিকার তারা সুনিশ্চিত করতে চায় অস্তিত্বের কারণেই, আর এখানেই কর্পোরেট পুঁজির দালালি করার প্রয়োজন আছে। সারা বিশ্ব জুড়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণপন্থার তাণ্ডব শুরু হয়েছিল — তখন কোনও কোনও তাত্ত্বিক একে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি, সংস্কৃতির উত্তর আধুনিকতার পূর্ণবয়স্কতা বলেছিলেন, ভারতীয় মিডিয়া ব্যাপক ভাবে তার প্রচার চালিয়েছিল তথাপি আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই উগ্রজাতীয়তাবাদ এর আক্রমণ থেকে তাঁরাও রেহাই পাচ্ছেন না। কর্পোরেট জগতের হাতের পুতুল হয়ে পড়ছেন, চিরাচরিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তছনছ হয়ে যাচ্ছে, এই বিবর্তনের ধাক্কা কম নয়। তাই ভারতীয় মিডিয়া আজ ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে ভয় পায়, কারণ সারা বিশ্বজুড়ে যে সীমাহীন লুঠ শুরু হয়েছে স্ব ঘোষিত দক্ষিণপন্থার উদারনৈতিক অর্থনীতির মাধ্যমে মিডিয়াকে হতে হচ্ছে তার অনুসারী, তার এই লুঠকে প্রশ্ন করা চলে না বরং এই লুণ্ঠনকে আরও অবাধ, নিরঙ্কুশ করতেই সে দায়বদ্ধ। কারণ তাঁর টিকি বাধা আছে কর্পোরেট প্রভুদের কাছে। "India's Free Press Problem : Politics and corporate interests invade journalism" -এ Ravi S. Jha বলেছেন "Subir Ghosh, Co-authour of "Sue the Messenger", a book about how corporate ownership and legal

harrasment by powerful business houses are shackling reportage and undermining democracy states, "If writing and reportage are shackled, it is democracy which gets undermined. It is people who lose their unfettered right to know". এহেন অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠনের পক্ষেই মিডিয়া বলবে বিরুদ্ধে নয়, এমতাবস্থায় খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই সংগ্রামের সংবাদ হয় পরিবেশিত হবে না হলেও তা বিকৃত করে প্রকাশ করা হবে, এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো গনতান্ত্রিক শক্তিকে কর্পোরেট পুঁজি চালিত মিডিয়া শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, চলচ্চিত্র অভিনেতা/অভিনেত্রীর পাকা দেখা থেকে শুরু করে আপ্যায়নের মেনু কার্ডের জন্য নিউজ প্রিন্ট খরচ করা হবে, অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে হবে না। আসলে মতামত তৈরীর কাজটা করতে গিয়ে সাম্প্রতিক দিনে জনমানসের রুচির পরিবর্তনের ঠিকা ও তারা নিয়ে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গে Sajeeth Attepurm 'Role of Corporate media in Today's world" শীর্ষক প্রবন্ধে খুব প্রণিধানযোগ্য একটি উক্তি করেছেন —

..... the role of the corporate media is to spread news favourable of big business corporations and promarket governments thus justifying privatisation of the Indian state owned companies, deregulation of petrol prices, showcasing luxary goods in the news channells, selecting and deselecting the news items depending on their TRPs and above all, lobbying among the millions of households in favour of these rich and powerful people".

কিন্তু....

এত করেও প্রভুর মন সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান শ্রেণীর নিরপেক্ষতায় প্রবল অনীহা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করাকে তারা ঔদ্ধত্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশদ্রোহিতা হিসাবে মনে করেন — তাই প্রথাগত সব মিডিয়াকে বশম্বদ বানানো যাবে না জেনেই তাঁরা কালবিলম্ব না করে বিকল্প ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মগ্ন। মিডিয়ার সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটিতে তারা খুব ভালো ভাবে আঘাত করেছেন আর বলতে বাধা নেই মিডিয়া তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেই সেই কবর খুঁড়েছেন। তাই মেইনস্ট্রিম মিডিয়াকে ব্রাত্য করে দিতে পেরেছেন It cell-এর কুশীলবরা। দেগে দেওয়া সহজ হয়ে গেল "Fake news". "Paid News"-এর স্টিকার, সব মিলিয়ে Polarization factor ভারতীয় মিডিয়াকেও আখাত করছে, তীব্র যন্ত্রনা সত্ত্বেও সে ভাবছে "..... পরশ তব এই তো পুরস্কার".....

তবে ..... মেইনস্ট্রিম মিডিয়াকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত করা খুব সহজ নয়, মিডিয়া বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেললে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার বা তার বিপরীতে দাঁড়ানোর সময়কালে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে পৌঁছবে কে? - তাই অন্তর্দর্শন চলুক, বিকল্প খোঁজাও চলুক, দ্বন্দ্ব ছাড়া যে বিকাশ হয় না। ❑

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার একশো বছর

প্রণব দত্ত

'জালিয়ানওয়ালাবাগ'-এই স্থাননামটি শতবর্ষ আগে সংঘটিত সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দানবীর হত্যালীলার সূত্রে আজ এক বৃহত্তর প্রতীকী তাৎপর্যে মন্ডিত হয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে। শাসকের প্রতাপমদ মত্ততা, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করার দুঃসাহস প্রদর্শন, নির্বিবেক ও নির্বিচার গণহত্যার কুৎসিততম দৃষ্টান্তরূপে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ-এ ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেজিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে সমবেত নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনা, যা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকান্ড নামে পরিচিত। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করেন।

কী ঘটেছিল সেদিন ? তার আগে পরেই বা কোন কোন ঘটনা ঘটেছিল, আজ একশো বছর পেরিয়ে এসে আমরা সংক্ষেপে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বুঝে নিতে চাই ইতিহাসের গতি পথে কোন বাঁকবদলের ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিল এই আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনা।

২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৯১৮-এর ১১ নভেম্বর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে (১৯১৪-১৮) ইংরেজদের বর্ধিত সামরিক ব্যয়ভার নির্বাহে পরাধীন ভারতের সম্পদ যেমন কাজে লেগেছিল, তেমনই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই তাই আশা করেছিল যে যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসক যুদ্ধকালীন কঠোর নীতিমালা সরিয়ে ফেলে শাসনব্যবস্থায় তাঁদের অংশীদারিত্ব স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে দেবে। ভাইসরয় নেপিয়ার চেমর্সফোর্ড ও ভারতবিষয়ক মন্ত্রী এডুইন স্যামুয়েল মন্টেগু সীমিত আকারে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলন করার একটা প্রস্তাব এনেছিলেন, কিন্তু সেটা বেশিদূর এগোয়নি, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৮) ভারতীয়দের অতি সাধারণ ও খুব সীমিত সুযোগ-সুবিধা দানের প্রস্তাব করেছিল। ফলস্বরূপ জনমানসে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। অ্যানি বেশান্ত ঘোষণা করলেন, '....it is ungenerious for England to offer and unworthy for India to accept'. দেশবাসীর প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ শাসক যুদ্ধকালীন নিপীড়নকে আরও স্থায়ী করার প্রচেষ্টায় প্রণয়ন করলেন দমনমূলক আইন 'দ্য অ্যানার্কিকাল এ্যান্ড রিউলিউশনারি ক্রাইমস অ্যাক্ট, ১৯১৯', যেটি আইনসভায় অনুমোদিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ৮ মার্চ। ব্রিটিশ বিচারক স্যার সিডনি রাওলাটের অধীনস্থ কমিটির সুপারিশে আইনমালাটি বিধিবদ্ধ ও সংগঠিত হয়েছিল বলে এটি 'রাওলাট আইন' নামে সুপরিচিত। এতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা থেকে শুরু করে বিনা বিচারে মানুষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি করা ও সরকার

নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার 'অপরাধ'-এ জুরি-বিহীন রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার ও শাস্তিদান এই আইনে অনুমোদিত হয়। হতাশ ভারতীয়দের কাছে এটি বাস্তবিকই প্রতিভাত হয়েছিল একটি 'কালা কানুন' রূপে।

রাওলাট আইনের কঠোর বিধিবিধান ভারতীয় নেতাদের কাছে এই বার্তা নিয়ে এল যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ব্যাপারে উপনিবেশিক শাসকের মনোভাব অনমনীয়। রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও কর্মীদের কাছে পরিষ্কার হতে থাকে যে, অংশীদারিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থার প্রত্যাশা অস্বচ্ছ থেকে কঠিন ও ক্ষীণ হচ্ছে'। প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের স্বায়ত্তশাসন অর্জন সম্ভবপর হতে পারে এই বোধ সঞ্চারিত হতে থাকে।

সেসময়ে সব রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকেই এই আইনের বিরোধিতা করা হয়। মহাত্মা গান্ধী এই আইন প্রত্যাহারের জন্য ভাইসরয়ের কাছে আবেদন করেন। এই আবেদনে কর্ণপাত করেনি ঔপনিবেশিক সরকার। তখন গান্ধীজি এই আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গণ-প্রতিবাদের পরামর্শ দেন। সেই অভিমুখেই ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ দেশবাসীর প্রতি তিনি এবং আরো ২৪ জন স্বাক্ষরকারী এক খোলা চিঠি পাঠান সত্যাগ্রহে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে। গান্ধীজির আহ্বানেই এই ২৪ জন মিলিত হলেন এক বৈঠকে, গড়ে উঠল 'সত্যাগ্রহ সভা'। এর সভাপতি হলেন গান্ধী। এই সভার পক্ষ থেকেই সারাদেশে 'হরতাল' পালনের আবেদন জানানো হল।

দু-দিন হরতাল হয়েছিল। ৩০ মার্চ দিল্লি ও পাঞ্জাবে আর ৬ এপ্রিল সারাদেশে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল হরতাল পালিত হবে ৩০ মার্চ, পরে তা বদলে ৬ এপ্রিল তারিখটি নির্ধারিত হয়।

দিল্লীতে ৩০ মার্চ হরতাল শান্তিপূর্ণ ছিলনা। আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলি চালাল, কয়েকজন নিহত হলেন, আহত অসংখ্য। ৩০ মার্চ রাজধানীতে সত্যগ্রহ পালনের উদ্যোক্তা ছিলেন হাকিম আজমল খান ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। সেদিন দিল্লীর জুম্মা মসজিদে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের সামনে বক্তব্য রাখেন আর্যসমাজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। সভা শেষ হলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে চাঁদনিচকের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ব্রিটিশ পুলিশ পথ আটকালে নেতাদের সঙ্গে যখন বচসা চলছে, তখন হঠাৎ পুলিশকে লক্ষ্য করে কোথা থেকে ইঁট, পাথর নিক্ষেপ করা হয়। প্রত্যুত্তরে নিয়ন্ত্র জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। মৃত্যু হয় পাঁচ জনের, আহত হন আরো অনেকেই।

এইদিন অমৃতসর শহরেও হয়েছিল হরতাল, তবে তা ছিল শান্তিপূর্ণ। প্রায় ত্রিশ-হাজার হিন্দু মুসলমান তাতে যোগ দেয়। নেতৃত্ব দেন ডা. সৈফুদ্দিন কিচলু।

দিল্লিতে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনার কথা ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দফায় সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় ৬ এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ষে। দেশের সমস্ত বড়ো শহর, ছোটো শহর, আধা শহর এলাকার জনগণ ওইদিন সামিল হয়েছিলেন প্রতিবাদে। কলকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় চিত্তরঞ্জন বলেন — 'রাওলাট আইন আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিকে নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া উঠিবার

পথে বাধা দিতেছে। সেই বাধা অতিক্রম না করিলে জাতি গড়িয়া উঠিবে না। সেই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য আমাদিগকে দেশপ্রেম জাগাইতে হইবে, সত্যগ্রহী হইতে হইবে, দ্বেষ হিংসা বর্জন করিতে হইবে'। এই 'সত্যাগ্রহ'কে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক অভূতপূর্ব প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় গোটা দেশ জুড়েই।

৬ এপ্রিল অমৃতসরেও শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালিত হয়েছিল। কিন্তু ৯ তারিখের পর থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। ওই বছরের ৯ এপ্রিল ছিল রামনবমী। এই উপলক্ষে বিরাট মিছিল হয়েছিল অমৃতসরে। যদিও এটি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান কিন্তু শাসকের চন্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওই বছর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মিলিতভাবে এটি পালন করে যা' সন্দিগ্ধ শাসকের স্মৃতিতে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের দিনগুলির কথা উশ্‌কে দেয়। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে (জালিয়ানওয়ালাবাগ কান্ডের তদন্ত করার উদ্দেশ্য গঠিত কমিশন) পরে লেখা হয় — 'মুসলমানরা বিরাট সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল ... হিন্দু মুসলমান ঐক্যে অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য নমুনা — নানান মতের মানুষ একপাত্র থেকে জল খেয়েছে'। ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুকে বন্দি করে অমৃতসর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় গোপনে। গান্ধীজী বম্বে থেকে পাঞ্জাবে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন জানতে পেরে ১০ এপ্রিল তাঁকেও বন্দি করা হয়।

রাওলাট আইনের দোহাই দিয়ে এই দুটি গ্রেপ্তারির খবরে অমৃতসর শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ১০ এপ্রিল জনতা প্রতিবাদ আন্দোলনে রাস্তায় নামে। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও শহরের হলগেট ব্রিজ রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে নিরস্ত্র জনতার মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়, বেশ কয়েকজন মারা যান পরিণামে উত্তেজিত জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক, টাউনহল, চার্চ আক্রমণ করে। আগুন ধরিয়ে দেয়। এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাসহ বেশ কয়েকজন ইউরোপিয়ানও খুন হন। গান্ধীর গ্রেপ্তার ও অমৃতসরের ঘটনার জেরে লাহোর, আমেদাবাদে ও পুলিশের সঙ্গে জনতার রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়। হান্টার কমিশনের রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'সংঘর্ষে দু-জন অফিসার নিহত হয়েছে, দাঙ্গাকারীদের মধ্যে নিহত ২৮, আহত ১২৩। এই সংখ্যা বেশি হবারও সম্ভাবনা আছে।

ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক দ্রুততা শাসককুলকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় ১১ এপ্রিল পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মাইকেল ও ডোয়ার (O' Dwyer) সেনাকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ারকে ঘটনার মোকাবিলার দায়িত্ব দেন। অমৃতসরের সেনা ছাউনিগুলিতে সশস্ত্র সেনার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সেনা মোতায়েন করে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ১১ই এপ্রিল রাতে অমৃতসরে এসে পৌঁছোলেন জেনারেল রেজিন্যাল্ড ডায়ার।

৩

১৩ই এপ্রিল ছিল নববর্ষের ছুটির দিন, বৈশাখী পরব। জেনারেল ডায়ার ১২ এপ্রিল অমৃতসর শহর পরিক্রমা করে চরম সাবধানের আদেশ ঘোষণা করে জানিয়ে দেন যে, জনসাধারনের প্রতিটি বিক্ষোভ জমায়েত বলপ্রয়োগে মোকাবিলা করা হবে। শহরের রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি বের হল। ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হল, কোনো রকম

হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটলে শহরবাসীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং সমস্ত রকম সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। বিক্ষুব্ধ জনতার পক্ষে পাল্টা ঘোষনা করা হয়, ১৩ এপ্রিল বিকাল সাড়ে চারটের সময় জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হবে, 'যেখানে লালা কানাইয়ালাল সভাপতিত্ব করবেন এবং জনসাধারণকে মূল্যবান উপদেশ দেবেন'।

অমৃতসর শহরে সাবেওয়ালা বাজার সংলগ্ন কিছু বাড়ি, গাছগাছালি আর অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা কয়েকটি সংকীর্ণ প্রবেশপথ সম্বলিত একটুকরো জমি, একপাশে একটি কুয়ো — এই নিয়েই জালিয়ানওয়ালাবাগের বিস্তার। ওই স্বল্প পরিসরেই সমস্ত ভয় তুচ্ছ করে প্রায় কুড়ি হাজার নিরস্ত্র মানুষ সেদিন সমবেত হয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিক ঘেরা উদ্যানে, প্রতিবাদসভায়। বৈশাখী মেলা উপলক্ষে শহরে আগত বেশ কিছু মানুষজনও হাজির হয়েছিলেন সেই সভায়। বেলা ২টো থেকে জনগণ বাগে সমবেত হতে শুরু করেছিলেন, অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ দেহাতী মানুষ, সঙ্গে মহিলা ও শিশুরাও ছিলেন।

সাড়ে চারটেয় সভা শুরু হওয়ার খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সভাস্থলে সসৈন্য পৌঁছে গেলেন জেনারেল ডায়ার। বৈশাখী পরবের দিনে সভায় জমায়েত বহু মানুষের পরনে নতুন পোশাক, মাথায় রঙিন পাগড়ি। মঞ্চ থেকে কবিতা পড়ছিলেন ব্রিজ বৈকাল, দুর্গাদাশ বৈদ পড়ছিলেন সভার প্রস্তাব - মুক্তি চাই ড. সত্যপাল এবং ড. কিচলুর। হঠাৎ জনতা খেয়াল করে, তাদের পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছে সশস্ত্র মিলিটারি। কী ঘটতে চলেছে বোঝার আগেই এবং কোনরকম সতর্কবানী উচ্চারণ না করেই উদ্যানের সংকীর্ণ পথ আটকে জেনারেল ডায়ারের হুকুমে বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র জনতার ওপর চলে নির্বিচারে গুলি বর্ষন। একটানা দশ মিনিট ধরে ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চলে জনতাকে তাক করে। নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন করেই ডায়ার তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত সরে যান। সরকারি হিসেব মতো এই গুলিচালনার ঘটনায় ৩৭৯ জন মানুষ নিহত এবং ১২০০-র বেশি আহত হন। স্থানীয় মানুষজনের ধারণায় সরকারি পরিসংখ্যান বাস্তব ঘটনার বীভৎসতা আড়াল করার 'মিথ্যা প্রয়াস মাত্র, প্রকৃতপক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, প্রায় হাজারের কাছাকাছি।

ওইদিন রাত্রিতেই শহরে জারি হল কারফিউ। ঘোষণা করা হল রাস্তায় দেখামাত্র গুলি করা হবে। ফলে আহতদের উদ্ধার করারও কোনো সুযোগ রইল না। অনেক আহত মানুষ সারা রাত মাঠেই পড়ে থেকে মারা গেলেন। শকুন শৃগালেও মৃতদেহ খেতে লাগলো। এইরকম ঠান্ডা মাথায় গণহত্যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে অমৃতসর সহ পাঞ্জাবে চলল অকথ্য সামরিক অত্যাচার, নির্বিচারে গ্রেপ্তার প্রকাশ্যে বেত মারা বিশেষ আদালত বসিয়ে শাস্তি দেওয়া, রাজপথে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা এই রকম নানা কদর্য পদ্ধতিতে চলে লাগাতার নির্যাতন। এই পরিস্থিতিতে ১৮ এপ্রিল গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। তিনি বললেন ঃ সত্যাগ্রহীদের হিংসাত্মক আচরণ তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর মতে এই আন্দোলন "A blunder of Himalayan miscalculations' ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ-এ নৃশংস হত্যালীলা সংঘটনের পর 'মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে কার্যতঃ অবরুদ্ধ পাঞ্জাবের পরিস্থিতির সংবাদ প্রেরনে ব্রিটিশ প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও কিছু কিছু খবর সে সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। একাধিক সূত্রে বিক্ষিপ্ত আকারে রবীন্দ্রনাথের কাছেও খবর পৌঁছোয়। নৃশংসতার এই সংবাদ বিচলিত করে তোলে তাঁকে। কবি পরিকর চার্লস ফ্রিয়ার এ্যান্ড্রুজ এর মারফৎ গান্ধীজির কাছে তিনি প্রস্তাব পাঠান যে তিনি নিজে এবং গান্ধীজী একসঙ্গে সামরিক আইন ভেঙ্গে পাঞ্জাবে ঢোকার চেষ্টা করবেন। কিন্তু গান্ধীজী কবির ঐ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে জানালেন যে এই সময়ে সরকারকে বিব্রত করতে তিনি রাজি নন। কবি স্বয়ং তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে গিয়ে কলকাতায় একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজনের অনুরোধ করেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় সম্পূর্ণ হতাশচিত্তে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। দেশের মানুষের এই চরম লাঞ্ছনার দিনে বিচলিত কবি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন - 'নাইটহুড' উপাধি প্রত্যাখানের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন রাজপ্রতাপের বিরুদ্ধে, তাঁর নিজেরই লেখা গানের কথাগুলি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠলো এক অন্য প্রেক্ষিতে — "যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় - তবে পরান খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে"। তদানীন্তন ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডকে লিখলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদপত্র, 'বজ্রানলে' আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' লেখা সেই পত্রে চিরকালের জন্য ধরা রইলো জ্বালাময়ী কিন্তু মার্জিত গদ্যের আধারে বেদনা মিশ্রিত, আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্থির প্রত্যয়ের দীপ্তি। সেই ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ চিঠিটির গোটাটাই এখানে উদ্ধৃত করা হল —

"Your Excellency,

The Enormity of the measures taken by the goverment in the Punjab for quelling some local distrurbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishment inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized governments, barring some conspicious exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless by a power which has the most terribly efficient organization for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignition roused in the hearts of our people has been ignored by our rules – possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as, salutary lessons. This collousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our

suffering, without rceiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers, knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the nobel vision of statesmanship in our government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength anf moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The times has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human being. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due deference and regret, to release me of my title of kinghthood which I had the honour to accept from His Majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration".

৫

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যালীলার ঘটনা আমাদের মননে, স্মৃতিতে জাগরূক থাকবে চিরকাল। শত শহীদের রক্তে রাঙা ওই বধ্যভূমি ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে দিশারী ধ্রুবতারার মতোই প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, দেশের জন্য আত্মবলিদানের মহত্বকে স্মরণ করাবে, সর্বোপরি আমাদের চেতনাকে শাণিত করবে এই মর্মে— শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলনে একমাত্র অভিমুখ হতে পারে জোটবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, 'দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে' ঘরে ঘরে নিশ্ছিদ্র প্রস্তুতি গড়ে তোলা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের শতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রামী উপলব্ধিই সঞ্চারিত হোক্ আমাদের মননে। স্মরণ করি - কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই অবিস্মরণীয় কাব্য পংক্তি —

'বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত ?
আর কতদিন দু চক্ষু কচ্‌লাবে?
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে।
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে'।

(ঠিকানা ঃ ছাড়পত্র)

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর এস্টেটের ইতিবৃত্ত

বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী

আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে কোন এক দিন (সম্ভবত ইং- ১৮৬৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর স্টেশনে নেমে পাল্কিতে করে চলেছেন রায়পুরের জমিদার সিংহদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রৌদ্র তপ্ত ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে আদিগন্ত বিস্তৃত পথ। তারি এক পাশে ডাঙ্গা জমিতে দাঁড়িয়ে এক জোড়া ছাতিম গাছ, নিঃসীম আকাশের নিচে উদার প্রকৃতির কোলে সেই সপ্তপর্ণীর ছায়ায় দুদণ্ড বিশ্রাম নিয়ে তিনি অনুভব করলেন প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার গভীর শান্তি। এই ছাতিমতলাটিকে তিনি একান্ত ঈশ্বর সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। বয়স্য প্রতাপ নারায়ণ সিংহের থেকে মৌরসি পাট্টা পেয়ে সেই স্থানে তিনি রোপণ করলেন নানাবিধ গাছ, একে একে তৈরি হল শান্তিনিকেতন বাড়ি, কাঁচের সুদৃশ্য উপাসনা গৃহ। সৃষ্টি হল আম আমলকী শাল বকুলের কুঞ্জ ঘেরা এক আদর্শ আশ্রম।

কিন্তু মহর্ষি হলেও প্রাজ্ঞ জমিদার দেবেন্দ্রনাথ সেই আশ্রমের জমিজমা ও আয়ব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে ভুললেন না। ১২৯৪ সালের ২৪এ ফাল্গুন (ইং ১৮৮৮) রেজিস্ট্রী করা হল শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডীড যার প্রথম তপশিলে উল্লেখিত হল শান্তিনিকেতন আশ্রমের জমির "তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরের ডৌল খরিজান, মৌজা ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে শান্তিনিকেতন নামক পাকা বাড়ি মায় তাহার তলস্থ ও চতুর্পার্শ্বস্থিত জমি ও বাগান আনুমানিক জমি বিশ বিঘা"। দ্বিতীয় তপশিলে উল্লেখিত হল হুগলী, কটক, নদীয়া, যশহর ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত দেবেন্দ্রনাথের আটটি সম্পত্তি যার থেকে ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ হবে। দলিলে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং সকল ধর্মের সাধুপুরুষদের নিয়ে ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর একটি মেলার আয়োজন। ১৮৭৫ সালের Survey Act অনুসারে Cadastral Surveyর তখন শৈশবাবস্থা, তাই বলাই বাহুল্য ট্রাস্ট ডীডের তপশিলোক্ত জমিগুলির কোন দাগ নম্বর নেই, তার জায়গায় দেওয়া আছে সেগুলির চৌহদ্দির বিবরণ। যেমন দ্বিতীয় তপশিলের আট নং ক্রমিকে সম্পত্তির বিবরণ "জেলা নদীয়া স্টেশন ও সাব রেজিস্ট্রী কুমারখালির মোতালেক নং মামুদশাহি ফউজ সেরকান্দির মধ্যে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ চিহ্নিত লিস্টের অন্তর্গত চৌহদ্দি ভুক্ত মোকরারি জোত ৭৯.৪ ।। বিঘা (উনঃ আশি বিঘা পাঁচ কাঠা চার গণ্ডা দুই কড়া) ক। চিহ্নিত লিস্ট ১। হরচন্দ্র অধিকারীর দক্ষিণ মহলে প্রামানেকর জমির পুর্ব জহাবকন জয়াদ্দার প্রভৃতির জমির উত্তর ঘঃ হরচন্দ্র মৌজায় ২।।৪ (দুই বিঘা দশ কাঠা চার গণ্ডা) ২।"। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের জমির প্রথম রেকর্ড হয় RS Operation এর সময় বোলপুর মৌজায় খাতিয়ান নং ৭৫৬, পরিমান ১৫.৮০ একর। স্বত্বের বিবরণ 'দখলকার বসতপ্রজা চিরস্থায়ী'। ট্রাস্টী হিসেবে উল্লেখিত ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁদের নাম RS Attestation এ বাদ গিয়ে নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও শৈলেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম (এস্টেটের পক্ষে) ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতন আসেন তখন তাঁর বয়স দশ কি এগারো, ট্রাস্ট ডীডে উল্লিখিত দ্বিতল শান্তিনিকেতন বাড়ি তখনো এক তলা। কিন্তু ট্রাস্ট ডীড রেজিস্ট্রী করার দুই বছর পরেই সপরিবার তাঁকে চলে যেতে হল শিলাইদহে জমিদারী তত্ত্বাবধানে। সেখানে জমিদারী তদারকি ও কাব্য রচনায় মগ্ন কবি, শিশু পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পনলেন তাঁর স্কুলজীবনে "নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্ব প্রিয় শিক্ষকদের" স্মরন করে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে শিশু মনে আনন্দ ও অনুসন্ধিৎসা না জাগাতে পারলে প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে ১৩০৮ সনের ১৩ই পৌষ (ইং ১৯০১) তিনি শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির কোলে পাঁছ জন ছাত্র ও দুইজন শিক্ষককে নিয়ে স্থাপন করলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়। শুরু হল শান্তিনিকেতন এস্টেটের দ্বিতীয় অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিতে পাই "অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৈপুন্যসাধন, দৃষ্টি ও মননশক্তির অনুশীলন, তরুলতা পশুপক্ষী ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ" প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি চেয়েছিলেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সবাই হবেন আবাসিক, ছাত্ররা আশ্রম ও আশ্রমের বাইরে গ্রামগুলিতে ঘুরে মাটি, শস্য, তন্তু ও খনিজ সংগ্রহ করবে, মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে পরিচিত হবে। অতএব প্রয়োজন হল জমি। শান্তিনিকেতন ঘিরে তখন তিন জমিদারদের জমিদারি। সুরুলের সরকার, রায়পুরের সিংহ ও তালতোড়ের ঘোষ। তাদের থেকে কখনো হাওলাত করে, কখনো স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করতে লাগলেন। কিন্তু জমি কেনাটাই যথেষ্ট নয়, তার জরীপ ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাজনা ভরা ও নামপত্তন প্রভৃতি হাজার ঝামেলা। শিক্ষা ও বিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত কবির এই বিষয়ে সহায় হয়ে ওঠেন তাঁর জমিদারির কিছু ভূতপূর্ব কর্মচারী যাদের মধ্যে ছিল জমি পরিচালনা করার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিদ্যানুরাগের এক আশ্চর্য সংমিশ্রন। শ্রী জগদানান্দ রায়ের বিজ্ঞান চর্চায় অনুরাগ দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁকে জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত করেন ও পরে আশ্রম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে। আরেকজন হলেন বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রথমে পতিসরে জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত হন ও পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকতেন বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদিপর্বে শিক্ষার সঙ্গে জমিজমা বিস্তারেও এই দুই অধ্যাপকের অবদান চিরস্মরনীয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমের খ্যাতি ও সেইসঙ্গে আর্থিক সঙ্গতি অনেকাংশে বেড়ে গেল ইং ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ায়। দেশ বিদেশ থেকে শান্তিনিকেতনে আসতে লাগলেন বহু অনুরাগী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক। ফলে প্রয়োজন হল নতুন ছাত্রাবাস, অতিথি আবাস ও বিদ্যালয় ভবনের। সংস্থান করতে হল আরো জমির, বর্ধিত হল এস্টেট।

শান্তিনিকেতন এস্টেট এর পরবর্তী পর্যায়ের বিস্তার হয় যখন আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ সেখানে উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইং ১৯২১ সনে বিশ্বভারতী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় যা রেজিস্ট্রি হয় ইং ১৯২২ সনে। এই সোসাইটির লক্ষ্য হয় শান্তিনিকেতনে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করার ফলে তিনি

বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত পরিকাঠামোর সংমিশ্রনে। তার জন্য প্রয়োজন হল বিপুল পরিমাণ জমির। ইং ১৯২৪ সনে বিশ্বভারতী সোসাইটি গ্রহণ করল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও উপনগরী গঠনের প্রস্তাব যার ভিত্তিতে তদানিন্তন প্রাদেশিক সরকারের কাছে পেশ করা হয় জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব সরকারী স্বীকৃতি পায় যার ফলে LA Case No. 4 of 1927-28 এর মাধ্যমে বিশ্বভারতী অনুকূলে অধিগৃহীত হয় বোলপুরে ও সুরুল মৌজায় ৭০৪ একর জমি যার দখল পাওয়া যায় ইং ১৯২৯ সনে। এরপর ইং ১৯৪২ সন থেকে শুরু করে সমগ্র চল্লিশের দশক ধরে আরও নয়টি জমি অধিগ্রহন মামলায় বিশ্বভারতী প্রভূত জমির মালিকানা পায় যার মধ্যে সাতটি ঔপনিবেশিক সরকার ও দুটি স্বাধীন ভারত সরকারের আমলে। এছাড়াও ইং ১৯৩৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সোসাইটি ক্রয় ও দানের মাধ্যমে জমির সংস্থান করতে থাকে। এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন স্থানীয় জমিদাররা, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও টাটা বিড়লা প্রভৃতি শিল্পপতিরা। দক্ষ পরিচালক রথীন্দ্রনাথ নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতি ও জমির সদ্ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্যে নানা অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যেমন জমিদার, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও শিল্পপতিদের দানে ক্রীত জমি বা নির্মিত বাড়ি দাতার নামাঙ্কিত করা, যার চিহ্ন বয়ে চলেছে রতনকুঠী, সিংহসদন প্রভৃতি। এছাড়া বিশ্বভারতী সোসাইটির সদস্যদের সেখানে বসবাস করার জন্য জমি লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সেলামী ও লীজ রেন্টের বিনিময়ে। এই পদ্ধতিতে বিশ্বভারতীর প্রায় নিরানব্বই একর জমি একশচল্লিশ জন সদস্যকে লীজ দেওয়া হয়। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর অধীনে প্রায় কুড়ি একর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় এক হাজার তিনশ একর জমি রয়েছে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর অধীন জমির তত্ত্বাবধান করা হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিত ট্রাস্ট ডিড অনুসারে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি পরিচালনার আইনী ও সাংগঠনিক ভিত্তি হল ১৯০৫ সালের Visva Bharati Act, এই আইনের পাঁচ নং ধারায় বলা আছে যে জমিজমা সহ সমস্ত asset বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত থাকবে এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত ক্রয়, বিক্রয় লীজ প্রভৃতির instrument উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে করতে হবে। এই আইনেরই বাইশ নং ধারা মতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের Executive Council বা কর্ম সমিতির হাতে এ বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar হবেন এই সমিতির Ex-offico কর্মসচিব। তাই বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্রয়, বিক্রয়, লীজ প্রভৃতির দলীলে বা চুক্তিপত্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কর্মসচিব। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত জমিজমার LR Record এ রায়তের নাম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কর্মসচিব উল্লেখ আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্বের সঙ্গে জমিজমার দেখভালের সুবিধার জন্য নিবন্ধকের অধীনে একজন সহ-নিবন্ধকের উপর এস্টেট অফিসারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

মৌরসি পাট্টা পাওয়া বিশ বিঘা জমি থেকে তেরশ একরের সম্পত্তি সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণের পথ সবসময় মসৃণ ছিল না। প্রথমদিকে ট্রাস্ট বা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জমি ও ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের নিজস্ব জমিজমা একইসঙ্গে একজন

ম্যানেজার তত্ত্বাবধান করতেন। সেই সময় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ও অন্যান্য কাজে যুক্ত ব্যক্তিরাও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত জমি কিনতে থাকেন। বিশ্বভারতীর জন্য জমি অধিগ্রহণ কালে দেখা গেল সেরকম কিছু পরিবার শতাধিক বিঘা ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে দখলে আছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বাধা প্রাপ্ত হতে লাগল। রবীন্দ্রোত্তর যুগে এই বিষয়ে রথীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহন সেন, ডি. এম সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে যুঝতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখা ও কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বসতিও বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান জলের প্রয়োজনে বিশ্বভারতী সংলগ্ন বাঁধগুলি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের বাধায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। অদম্য রথীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগে সেই সব জলাশয় অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেলন। এস্টেট সমস্যা আরও প্রকটিত হল রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর। পরবর্তী উপাচার্যগণ ছিলেন পুরোদস্তুর শিক্ষাবিদ, জমিজমার সঙ্গে তাঁদের কোনো সংশ্রব ছিল না। ষাটের দশকে বিশ্বভারতীর এস্টেট অফিসারের দায়িত্ব সামলান শ্রী নিতাই বসাক যিনি ছিলেন আদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুকার। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ সাল অবধি দীর্ঘ দুই দশক এস্টেট অফিসারের পদ ছিল শূন্য। ফলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হল; বিশ্বভারতী সোসাইটির বেশ কিছু সদস্য যাঁদের সেখানে বসবাস করার জন্য জমি লীজ দেওয়া হয়েছিল, মাঠ খসড়া ও পরবর্তী LR Record এ রায়তী স্বত্বে স্বত্ববান হন, এমনকি তাঁদের কেউ কেউ লিজের শর্ত অমান্য করে তৃতীয় পক্ষকে জমি হস্তান্তর করেন। একই ভাবে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কিছু দাগ LR Record এ ট্রাস্টীদের নামে রায়তী রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়। বিশ্বভারতীর অনুকূলে অধিগৃহিত জমিতে স্বাধীনতাপূর্ব আমল থেকেই বালিয়াপাড়া, কালিমোহনপুর ও পিয়ার্সন পল্লী নামে তিনটি আদিবাসী পল্লী অবস্থিত ছিল যাদের বাসিন্দাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামিল করতে চেয়েছিলেন বলে কখনো স্থানান্তরিত করা হয় নি। বর্তমানে তাদের মধ্যে থেকে জমির সত্ত্ব ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। এছাড়া অন্যান্য সরকারী সংস্থার মত বিশ্বভারতীও জমি জবরদখলের সমস্যায় আক্রান্ত।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। শান্তিনিকেতনও বিশ্বভারতীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও বিঘ্ন এসেছে বা আসবে। কিন্তু একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও সাধনার এই প্রতিষ্ঠান যে বাস্তবের জমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তার সুরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে সেই বিঘ্নকে অপহৃত করার প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর, বিশেষ করে তাঁদের এস্টেট অফিসের তরফে অব্যাহত আছে। আর এ প্রচেষ্টায় তাঁদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সদাই তৎপর।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন-এর প্রস্তুতিপর্বে গত ৭ই জুলাই, ২০১৯ তারিখে সমিতি দপ্তরে কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম সভাটি আহৃত হয়। সময়ের ও পরিস্থিতির নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় বেশকিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভার কাজ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রণব দত্ত এবং অন্যতম সহ-সভাপতি গৌতম কুমার সাঁতরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং সাম্প্রতিক কালপর্বে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায় প্রয়াতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যদিয়ে প্রয়াতদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক, চঞ্চল সমাজদার সভার 'এ্যাজেন্ডা নোট'কে সামনে রেখে তাঁর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি, সংগঠন এবং আশু করণীয় বিষয়গুলিকে সামনে রেখে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে তাঁর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন। সভায় উপস্থিত ১৬টি জেলার প্রতিনিধি এবং ২ জন জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদক সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সুচিন্তিত ও মূল্যবান মতামত সভার সামনে রাখেন।

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উল্লেখিত প্রসঙ্গ, কোষাধক্ষ্যের পেশ করা সমিতির আয়-ব্যয়, তহবিল সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধিদের মতামত সমৃদ্ধ আলোচনাকে মূলধন করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি। সভার শেষপর্বে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের প্রস্তাবনা সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনার নির্যাস ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নীচে বিবৃত করা হ'ল —

১. **পরিস্থিতির পর্যালোচনা ঃ**

১.১ ১৭তম লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষমতাসীন NDA জোট তাদের ক্ষমতার শিকড়কে আরো গভীরে প্রোথিত করেছে। যার মধ্যে BJP নিরঙ্কুশভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিগত এই সময়কালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা, বিরোধী নেতৃবর্গ তো বটেই এমনকি তার নিজের দলের থেকেও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, তা'হল ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক আগ্রাসন, দেশের একটা বড় অংশের মানুষের মনে বৈধতা লাভ করেছে।

১.২ অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দীনতাও প্রকট হয়ে পড়েছে একই সময় নোটবন্দি, জি.এস.টি, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ, বেকারত্ব এর মতো বিষয়গুলি নিয়ে, বিরোধী দলগুলি রাজনৈতিক বিবৃতি/তরজা ছাড়া কোন ধারাবাহিক গণ আন্দোলন

গড়ে তুলতে পারে নি। এমনকি বামপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলন ভোটের বাক্সে সমতুলভাবে ব্যালটে প্রতিভাত হয়নি। এর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় সুরক্ষা বিতর্কে NDA-এর রাজনৈতিক চালের কাছে বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়েছে।

১.৩ এরসঙ্গে অবশ্যই যোগ হয়েছে দেদার অর্থ, কর্পোরেট জগতের খোলাখুলি সমর্থন, মিডিয়ার একপেশে তথ্য সরবরাহ এবং Data Analytics এর সুকৌশলী ব্যবহার।

১.৪ আঞ্চলিক দলগুলির সীমাহীন দুর্নীতি, অপশাসন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সুবিধাবাদ, মানুষ মেনে নিতে রাজী হয় নি। আমাদের রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল বামপন্থীরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া তো দূরের কথা আরো গভীরতর সংকটে পড়ে গিয়েছেন। ৩৯টি আসনে বামপন্থী প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কাছে বামপন্থীদের প্রতি আস্থাশীলতার ক্ষেত্রে নিদারুণ ক্ষয় পরিলক্ষিত হয়েছে।

১.৫ এখন মূল সংকটটা হল সংবিধানের মূল ধাঁচাটা রক্ষা। একটা ফ্যাসিবাদী শক্তি যখন বিপুল জনাদেশ নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তখন তাদের Political Agenda-য় থাকা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে দূরে ঠেলে, সংবিধান রক্ষা করাই মূল চ্যালেঞ্জ।

১.৬ পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে আরব উপসাগর অঞ্চলে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যে তাল ঠোকাঠুকি সুরু হয়েছে তার প্রভাব হতে পারে সুদূর প্রসারী।

১.৭ আসলে কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসন থেকে শ্রমিক কৃষক তথা আপামর শ্রমজীবি শান্তিকামী মানুষের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত বাঁচাতে গেলে লড়াই ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। এ লড়াই মতাদর্শের। এ লড়াই দীর্ঘমেয়াদী। এ লড়াই অসম। কোন বিকল্প নেই, নির্বাচনী লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়লেও এ লড়াই জিততে হবে। এই Paradigm Shift প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই আমরা উন্নত চেতনা সম্পন্ন হয়ে উঠব।

২. **বিগত কর্মসূচী ঃ**

২.১ বিগত কয়েকমাস লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমিতির কর্মী নেতৃত্ব নিযুক্ত থাকার কারণে সমিতিগত তৎপরতায় কিছুটা ঘাটতি হয়েছে। জেলাসফর বা কর্মসূচী সম্পন্ন করা যায় নি। যদিও মুর্শীদাবাদ সহ বেশ কিছু জেলা DEC সম্পন্ন করতে পেরেছে।

২.২ নির্বাচনী কাজে শতব্যস্ততার মধ্যেও গত ১লা মে, ২০১৯ সমিতি দপ্তরে ঐতিহাসিক মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হয়েছে।

২.৩ গত ২৩ শে মে সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নির্বাচনী কর্মব্যস্ততার কারণে অনুগামীদের নিয়ে সভা না করা গেলেও কেন্দ্রীয় দপ্তরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনাড়ম্বর ভাবে দিনটি প্রতিপালিত হয়।

৩. ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ ঃ

৩.১.১ বদলী ঃ

বিগত সময়কালে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন ব্লকে LR ROR এর Final Publication প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে ৫২ জন R.O. -কে Deputation Posting দেওয়া হয়েছিল। সমিতি প্রথম থেকেই এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল। এই সম্পর্কে সমিতি তার অভিমত স্মারক নং ০৩/ALLO/২০১৯, তাং ০১/০২/২০১৯ মারফৎ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করে। অবশেষে সমিতির লাগাতার Persuation এর ফল শ্রুতিতে তাদের বদলীর আদেশনামা জারী করা সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে সম্প্রতি ৪৭ জন R.O.-র, A-zone-এর জেলাগুলিতে First Posting হয়েছে। R.O.-দের বকেয়া Transfer-এর বিষয়টি নিয়ে লাগাতার Persuation জারী আছে।

ইতিমধ্যেই ISU-তে SRO-II স্তরের আধিকারিকদের A এবং B Zone থেকে Transfer-এর সময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। সমিতি যথাসময়ে তা কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছে এবং সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছে। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র Inter Zonal Transfer দিতে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু সমিতির চাপের প্রভাবে বেশ কিছু Intra Zonal Transfer এর বিষয়েও সহমত পোষণ করেছেন। জেলাগুলির অভ্যন্তরেও Longest Staying BL & LRO-দের Transfer এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সমিতির ন্যায্য দাবীর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

Departmental Policy মতো, SRO-I-দের Transfer-এর বিষয়টিও সমিতির বিবেচনায় রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে অতি দ্রুত এবিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষিতে নামতে সমিতি দায়বদ্ধ।

৩.১.২ অতি সম্প্রতি মালদা জেলার এক বরিষ্ঠ রাজস্ব আধিকারিককে অন্যায়ভাবে Transfer করা হয়েছে। সমিতি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।

৩.২ **Promotion :**

৩.২.১ এই সময়কালে ৬০ জন আধিকারিক RO থেকে SRO-II পদে Promotion পেয়েছেন। যদিও তাঁদের Posting সংক্রান্ত আদেশ নামা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত SRO-II-দের Transfer এর আদেশ নামার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা প্রকাশিত হবে।

৩.২.২ ভূমিদপ্তর সূত্রে খবর যে কয়েক জন SRO-II কে Director Office-এ Posting করানো হবে জেলাগুলির Online Mutation-এর কাজ তদারকির জন্য, যদিও এই সংক্রান্ত কোন আদেশনামা এখনো প্রকাশিত হয়নি।

৩.৩ SRO-II থেকে WBCS (Exe.) পদে Promotion-এর ফাইলে বিগত সময়কালে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

৪. সংগঠন ও আন্দোলন ঃ

৪.১ পুনর্নবীকরণ ঃ

২০১৯ সালের পুনর্নবীকরণ জুলাইয়ের মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। আশাকরা যায় যে লোকসভা নির্বাচন জনিত ব্যস্ততার Back-log কাটিয়ে আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজ ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে গুটিয়ে ফেলতে হবে।

৪.২ নবাগত WBSLRS Gr-I প্রসঙ্গে ঃ

২০১৭ ব্যাচের ৯২ জনের Appointment হয়েছে। ২রা জুলাই থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত নবান্নে তাদের VR সংক্রান্ত কাজ চলছে। এই সময়ে নবাগতদের সঙ্গে পরিচিতি এবং তাদের সহযোগিতা করার বিষয়ে সমিতি বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে। জেলার কর্মী নেতৃর্ত্বকেও এবিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। উপস্থিত জেলা প্রতিনিধিদের হাতে তাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। নবাগতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে; সমিতির এবিষয়ে মূল্যায়ন হল, সোস্যাল মিডিয়ার যোগাযোগ অপেক্ষা সরাসরি ব্যক্তিস্তরে যোগাযোগ অনেক বেশী কার্যকরী।

৪.৩ তহবিল ঃ

আপনারা জেলার তহবিল সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য জানাবেন যেমন জেলার মোট সদস্যসংখ্যা, পুনর্নবীকরণ কত জন করেছেন, কতজন এবং কে কে পুননবীকরণ এখনও করেন নি এবং কেন করা যায় নি ইত্যাদি। এই তহবিলের কেন্দ্রীয় প্রাপ্য অংশ দ্রুত জমা দেবেন।

এছাড়া বিভিন্ন জেলায় তাদের গচ্ছিত তহবিল Defunct A/c-এ পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করার উদ্যোগে বেশ কয়েকটি জেলায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আপনারা এবিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।

৪.৪ সার্ভিস প্রসঙ্গে ঃ

ক্যাডারদের নিয়ে Departmental Service গঠন প্রক্রিয়ার দোদুল্যমানতা এখনও বজায় রয়েছে। অতিসম্প্রতি সমিতি এবিষয়ে পুনরায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে পত্র দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। যদিও আমাদের Department-এ অপর দুটি সংগঠন এবিষয়ে কী পদক্ষেপ নিয়েছেন বা দৃষ্টিভঙ্গীটাই বা কী এই সময়কালে তার কোনো বহিঃ প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে ক্যাডার স্বার্থবাহী এই রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে সংগঠনগুলিকে আরো বাস্তববাদী ও বিচক্ষণ হওয়া উচিত এবং ক্যাডার স্বার্থে ঐক্যমতের ভিত্তিতে জোরদার আন্দোলনে নামা উচিত।

এবিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা অপর দুটি সংগঠনকে আহ্বান জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাদের দিক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নি।

৪.৫ **আসন্ন রাজ্য সম্মেলন ঃ**

বিগত কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সভায় সমিতির সপ্তদশ (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে যে আলোচনা হয়েছে তাতে আগামী ১১-১২ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে স্থান হিসেবে শিলিগুড়ির নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে এবিষয়ে প্রাথমিকভাবে কথা বলা হয়েছে এবং তারা সোৎসাহে সম্মতি জানিয়েছেন।

৫. **আশু করণীয় বিষয়ক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঃ**

৫.১ বকেয়া DA, Pay Commission-এর দ্রুত ও সঠিক রূপায়ন ও বিভাগীয় Service গঠনের দাবীকে কেন্দ্র করে আগামী ৩১শে আগস্ট, ২০১৯ তারিখে কলকাতায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে 'কেন্দ্রীয় হলসভা' অনুষ্ঠিত হবে।

৫.২ আগামী ৩১শে আগস্টের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষে জেলায় জেলায় Extended DEC সম্পন্ন করতে হবে।

৫.৩ আগামী ৩১ শে অগস্ট, ২০১৯ তারিখে কেন্দ্রীয় দাবী সভাকে সফল করার জন্য ব্যাপকতম অংশ গ্রহণে জেলাস্তরে অনুগামীদের উৎসাহী করতে হবে।

৫.৪ কেন্দ্রীয় হলসভার আগে সমিতি প্রেরিত দাবী সনদের সমর্থনে ক্যাডারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। জেলা স্তর থেকে সংগৃহীত 'দাবী-সনদ' কেন্দ্রীয়ভাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত হবে।

৫.৫ আগামী 31st July-র মধ্যে সদস্য পুনর্নবীকরণের কাজ শেষ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ধার্য পরিমাণ, কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৬ ইতিপূর্বে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যে সব জেলা কমিটি তাদের জেলা তহবিলের অর্থ কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করেননি তারা অবশ্যই এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবেন এবং অকার্যকরী Bank A/c গুলি কার্যকরী করে সঞ্চিত তহবিল, কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণের উদ্যোগ নেবেন।

৫.৭ রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে আগামী নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ভাবে 'রক্তদান শিবিরের' উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫.৮ আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসের বেতন থেকে SST সংগ্রহ করতে হবে। SST-হার হল - মোট বেতন ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৬০০ টাকা এবং ৪০,০০১ টাকা - ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ টাকা ৬০,০০০ টাকার উর্দ্ধে ১০০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যরা নির্ধারিত হারের সঙ্গে অতিরিক্ত ২০০ টাকা দেবেন।

৫.৯ আগামী জানুয়ারি ২০২০-তে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলন-এর কথা মাথায় রেখে ডিসেম্বর' ১৯ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সম্মেলন গুলি ও তৎপূর্বে ইউনিট সম্মেলন সম্পন্ন করতে হবে।

আন্দোলন-সংবাদ

জেলায় জেলায় হলসভা থেকে 'দাবী-প্রস্তাব' গ্রহণ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ক্যাডারগত বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের দীর্ঘকালীন অপূরিত দাবী, RO দের 'C' group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম প্রদান, ব্লকস্তরের অফিসগুলিতে কায়েমীস্বার্থপুষ্ট দুষ্কৃতকারীদের আক্রমন, আমলাতান্ত্রিক অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত, জনস্বার্থবাহী কাজগুলির ত্বরান্বিতকরণে যথাযথ পরিকাঠামোর প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার প্রতিকারে অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং অপূরিত দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে গত ৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে জুলাই-আগস্ট মাস ব্যাপী জেলায় জেলায় বর্ধিতায়তন জেলা কমিটির সভা করে আন্দোলন কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে এবং সভা থেকে গৃহীত 'দাবী-প্রস্তাব' সমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। একইসঙ্গে জেলাগত দাবী সমূহকে সমীকৃত করে আগামী ৩১শে আগস্ট তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্রে 'কেন্দ্রীয় জমায়েত' অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই সভা থেকে গৃহীত 'দাবী-সনদ' পরবর্তীতে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তের অনুসৃতিতে জেলায় জেলায় জেলা-কমিটি গুলি ইতিমধ্যেই কর্মসূচীটি সাফল্যের সংগে প্রতিপালন করেছে। এই সভাগুলিকে কেন্দ্র করে জেলা-সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। জেলা-কমিটির সমস্ত সভাগুলিতেই এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এইসব সভাগুলি থেকে দুই প্রস্থ 'দাবী-সনদ' গৃহীত হয়, একটি সমন্বয়ানে সমস্ত জেলা থেকে গৃহীত হয় এবং আরেকটি প্রস্তাব জেলার সুনির্দিষ্ট দাবী দাওয়াভিত্তিক যার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাহর্তা ও জেলা ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা-সভাগুলি থেকে গৃহীত দাবী প্রস্তাবের বয়ান এই প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত করা হল।

জেলা-সভা থেকে গৃহীত 'দাবী-প্রস্তাব'

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর .... জেলা কমিটির বর্ধিতায়তন এই সভা গভীর উদ্বেগ ও হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য অংশের মানুষজনের সঙ্গে ভূমি-সংস্কার প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে কর্মরত আর.ও, এস.আর.ও-২ এবং এস.আর.ও-১ ক্যাডারভুক্ত আধিকারিকবৃন্দের বৃত্তিগত ন্যায্য দাবী-দাওয়া সমূহ নিরসনে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সদিচ্ছাপ্রসূত উদ্যোগের কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও তার রূপায়ণে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চলেছে যা সর্বস্তরে ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। একইসঙ্গে মূল্যসূচকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন, কার্যতঃ প্রকৃত আয়ের নিরিখে আমাদের বেতনপ্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

একইসঙ্গে আমাদের তিনটি ক্যাডারের দীর্ঘদিনলালিত এল.আর. 'সার্ভিস' গঠনের দাবী (আর.ও, এস.আর. ও-২ এবং এস.আর. ও-১ ক্যাডারদের সমন্বয়ে) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। 'টাস্ক ফোর্স' গঠন বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি বিচার বিবেচনার ইঙ্গিত দেওয়া হলেও, এ ব্যাপারে সঠিক মাত্রায় গুরুত্ব প্রদানে বরাবরই অনীহার প্রকাশ ঘটতেই আমরা দেখেছি। অথচ ভূমি সংস্কার প্রশাসনকে আরো কার্যক্ষম করে তোলার প্রশ্নে, বিভাগীয় আধিকারিকদের 'বিশেষজ্ঞতা'কে বিভাগের অভ্যন্তরে যথাযথ ব্যবহারের স্বার্থে প্রকারান্তরে এই দপ্তরের মাধ্যমে জনপরিষেবার কাজকে আরো গতিশীল এবং বাস্তবোচিত করার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার সূত্রেও এই দাবীটির সত্বর নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

এরই পাশাপাশি বকেয়া কাজের পরিমাণের তুলনায় আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অপ্রতুলতা, অসংখ্য শূন্যপদ পূরণ না হওয়া এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ঘাটতির কারণে কাজের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে অথচ প্রত্যাশিত পরিষেবা দেবার প্রশ্নে জনগণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফললাভ সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করছে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী ও অপরিকল্পিত নানান নির্দেশাবলী প্রেরণের মাধ্যমে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ না হওয়ার কারণে এবং তৃণমূলস্তরে আমাদের অংশের যে তিনটি ক্যাডার কর্মরত তাঁদের সঙ্গে উপযুক্ত মতবিনিময়ের পরিসর ক্রমসংকুচিত হওয়ার কল্যাণে এই ধরণের বিপত্তি ইদানীং আরো বেশি বেশি করে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের 'ফতোয়া' জারি করে কর্তব্য সাঙ্গ করার মনোভঙ্গি আখেরে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করছে। কাজের পরিমাণগত মানের সঙ্গে গুণগত মানের সার্থক সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অন্তরায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এরই পাশাপাশি রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায়, ভূমি সংস্কার দপ্তরগুলিতে কায়েমী স্বার্থপুষ্টদের 'দাদাগিরি', অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, অনৈতিক ও বে-আইনী কাজের জন্য চাপসৃষ্টির প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। বীরভূম, জলপাইগুড়িসহ বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েকটি ঘটনায় বি এল এন্ড এল আর ও অফিসগুলিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে, সরকারী রয়্যালটি আদায়, বে আইনী বালি / পাথর উত্তোলনের জন্য জরিমানা আদায় করতে দিয়ে আধিকারিক ও কর্মচারীরা আক্রান্ত হয়েছেন অথচ নিদারুণ পরিতাপের বিষয় দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসন কার্যতঃ ব্যর্থ! সৎ, নিষ্ঠাবান সরকারী কর্মীদের কর্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে ইত্যাকার দৃষ্টান্তসমূহ তাঁদের নিরুৎসাহিতই শুধু করছে না, আইনানুগ প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্তরায় সৃষ্টি করে কার্যতঃ কাজের সুষ্ঠু পরিবেশাকেই বিঘ্নিত করাছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজকের এই সভা থেকে ক্যাডারস্বার্থবাহী তথা জনপরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিম্নিলিখিত দাবীসমূহ সদ্বিবেচনাপূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জোরালো দাবী জানানো হচ্ছে —

১) ষষ্ঠ পে-কমিশনের রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশসাপেক্ষে অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য (w.e.f. ১.১.১৬) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২) অবিলম্বে মহার্ঘভাতার সমস্ত বকেয়া কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) অবিলম্বে সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী Cadre Strucrture-এ প্রার্থিত পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে SRO-II ও SRO-I ক্যাডারদ্বয়ের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে ১৬নং বেতনক্রম প্রদান করে SRO ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে এবং ১৭, ১৮ এবং ১৯নং বেতনক্রমের নির্দিষ্ট পদসমূহে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়িক প্রোমোশন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) WBSLRS, Gr-I কে WBCS 'C' Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ বর্তমানে ১৫নং স্কেল প্রদান করতে হবে।

৫) উচ্চতর পদবৃদ্ধি সাপেক্ষে RO, SRO-II ও SRO-I ক্যাডারদের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে SRO ক্যাডার সৃষ্টির মাধ্যমে বিভাগীয় সার্ভিস সৃষ্টি করতে হবে।

৬) বর্তমানে WBSLRS, Gr-I পদে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত কমপক্ষে ২০০টি পদ ভূমি সংস্কার প্রশাসনের স্বার্থে প্রস্তাবিত SRO পদে উন্নীত করতে হবে।

৭) ক) ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজে গতিশীলতা আনতে আধিকারিক ও কর্মচারীসহ প্রতিটি স্তরে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

খ) অবিলম্বে SRO-I, SRO-II এবং RO Cadre-দের ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৮) ক) SRO-I, SRO-II শূন্যপদে অবিলম্বে প্রোমোশন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) RI থেকে RO পদে যথাসময়ে প্রোমোশন দিতে হবে।

৯) E-Bhuchitra থেকে উত্থিত যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে জন পরিষেবামূলক কাজের অন্তরায় দূর করতে হবে। 'লিংক' ও 'Connectivity'র উন্নতিবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০) অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১) ক) নিয়মিত ও সময়মতো বদলী আদেশ প্রকাশ করতে হবে। সমিতি প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারীকদের 'বদলীনীতি'তে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে।

খ) Compassionate Ground-এ বদলীর বিষয়টিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করতে হবে।

গ) পাঁচ বছর মেয়াদান্তে Other wing থেকে Intergrated Set up-এ ক্যাডারদের ফিরিয়ে আনতে হবে। অপরদিকে Other wing এ বরিষ্ঠতা ও Option অনুযায়ী Posting করতে হবে।

১২) সকল WBSLRS, Gr-I দের সময়মতো Confirmation প্রদান করতে হবে।

১৩) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ACR-এর অভাবে ক্যাডারদের বিভাগীয় স্তরে পদোন্নতি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পূরণ করতে হবে।

১৪) অবিলম্বে গ্রেডেশন তালিকা সংস্কার ও হালতক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৫) শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত সরকারী ছুটির দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

১৬) WBCS (Exe.) পোস্টে প্রোমোশন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম ফীডার SRO-II দের 'Zone of Consideration'-এর পরিসর সম্প্রসারিত করতে হবে। কেবলমাত্র Willing SRO-II দের নিয়ে Eligibilty List তৈরি করতে হবে।

১৭) সকল BLLRO অফিসে গাড়ীর সংস্থান করতে হবে।

১৮) সময়মতো সকল Departmental Peoceedings এর নিস্পত্তি ঘটাতে হবে।

১৯) ক) সকল অফিসে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রসাধন কক্ষের সংস্থান করতে হবে।

খ) মহিলা আধিকারিকদের জন্য প্রকাশিত Child Care Leave -এর আদেশনামার ভিত্তিতে ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা বন্ধ করতে হবে।

২০) প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, অপচয় বন্ধ করা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১) উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের নিয়মিত মতবিনিময়ের পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

সভাপতি

তারিখ ঃ

স্থান ঃ

প্রস্তাবের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল ঃ-

১) মাননীয় প্রধান সচিব, ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ ও ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২) মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩) মাননীয় ভূমি লেখ্য ও জরিপ অধিকর্তা এবং যুগ্ম ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৪) মাননীয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা, ... জেলা।

৫) মাননীয় জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক .... জেলা।

সমিতিগত তৎপরতা

সম্প্রতি এস.আর.ও-১দের বিভাগীয় একটি 'বদলি আদেশ'কে কার্যকর করার সূত্রে আদেশপ্রাপ্ত আধিকারিকদের 'রিলিজ' করা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায় অস্বীকার করে আধিকারিকদের উপর নজিরবিহীনভাবে সেই দায় চাপানোর চেষ্টা করে একটি আদেশ প্রকাশিত হয়। নীতিগতভাবে এই অবাঞ্ছিত বিষয়টির প্রতিবাদ করে মাননীয় বিভাগীয় প্রধান সচিবের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পত্র প্রেরিত হয়। সকলের জ্ঞাতার্থে উক্ত পত্রটি নীচে মুদ্রিত করা হল —

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL
CENTRAL COMMITTEE

Memo. No. 10/ALLO/2019

Date : 31.07.2019

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah-700 102

Re : Initiation of DP on failure of joining on transfer/posting.

Ref :. Memo. No. 2858- Apptt dated: 29/07/19 of the Deputy Secretary, Section R1, Appointment Branch, L&LR and RR&R Department read with No. 2734-Apptt dated 29/08/18 and No. 223-Apptt dated 15/01/19 of the L&L.R and RR&R Department,

Sir,

Drawing your kind attention to the memos under reference, humbly, I would like to state that there exists a veiled threat of initiation of DP against the incumbents on failure to join their new place of posting.

It needs to be mentioned here that the release of the transferred officers depends on the controlling authority and not the incumbent himself. An officer cannot get release by himself on his own without obtaining a proper release order from the appropriate authority.

We also fail to understand why your good office failed to question the respective authority as to why the transferred officers were not released. Further, we can give a list of SRO-Is and SRO-IIs who had not been released from different districts and authorities in spite of similar order of transfer.

Hence, we are at a loss and fail to comprehend why these three *poor* officers had been singled out for initiating a DP against them.

The matter is nothing but colourable exercise of power and devoid of any rhyme or reason and absolutely devoid *of any* transparency or equality of treatment. The responsibility, if any, should be fixed on the authorities/controlling officer and not the poor officers as such.

As, the tendency is draconian on the part of the highest authority, we have no recourse but to lodge a modest protest in order and for the sake of reinforcing responsible administration which is going to shambles day by day.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

প্রয়াণ-লেখ

শ্রদ্ধায় স্মরণে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়, আমাদের সকলের প্রিয় অজয়দা চলে গেলেন। গত ২৪শে জুলাই, ২০১৯ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে দেশভাগের পর রাজ্যে সরকারী কর্মচারী আন্দোলন সংগ্রামের গঠন, তাকে বিকশিত করা এবং সাধারণ জনগণের দাবী আন্দোলনের সংগে তাকে সমন্বিত করার অন্যতম পুরোধা স্থপতি ছিলেন কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়।

১৯২৮ সালে ২৭শে আগষ্ট অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্ম। পিতা অমূল্য মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী; প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই। ১৯৪৭ দেশভাগ-এর সময় বাবা মা, পাঁচ ভাই, দুই বোনের বৃহৎ সংসার নিয়ে এদেশে চলে আসেন। কষ্টসাধ্য জীবন। এরই মধ্যে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সামাজিক ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে আন্তরিক নিষ্ঠার সংগে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসতেন।

১৯৫০ সাল দেশভাগের পর প্রথম পি.এস.সি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করে মহাকরণে আমাদেরই দপ্তর তৎকালীন ভূমি ও ভূমি দপ্তরে অবরবর্গীয় করনিক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। শুরু হয় জীবন-জীবিকার আন্দোলন সংগ্রামের পথে এক নতুন জীবনধারা। স্বাধীনোত্তর দেশে স্বাধীনতার সময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করে। সমাজের অন্য অংশের মানুষ তথা শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব আন্দোলনের সংগে কর্মচারী সমাজেও শুরু হয় নানা দাবীতে তথা সম্মানের সংগে চাকুরী করা, সুষ্ঠু ভাবে বাঁচার মতো মজুরী এবং অধিকার অর্জনের আন্দোলন যেখানে অজয়দা ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠেন একজন অন্যতম কান্ডারী ও পথ প্রদর্শক। সংগঠন জীবনের শুরুতে নিজ ক্যাডারগত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ক্রমান্বয়ে নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন ১৯৫৭ সালে এবং ১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বভার পালন করেন। ইতিমধ্যে পরিস্থিতির জটিলতা ও শাসকবর্গের আক্রমণ মোকাবিলার পথে কর্মচারী আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উপস্থিত হল। উপলব্ধ হল - কর্মচারীদের ক্যাডারভিত্তিক নিজস্ব দাবী ও কর্মচারী সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেমৌলদাবী অর্জনের প্রশ্নে আন্দোলন সংগ্রামের ধারাকে যথাযথ মাত্রায় বিন্যস্ত করা প্রয়োজন, ১৯৪৬ সালে তৈরী হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রশাসনের অভ্যন্তরে সমস্ত ক্যাডার সংগঠনের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মঞ্চ। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে শুরু হয় এক নতুন গতিধারার অত্যন্ত দ্রুতলয়ে ছড়িয়ে পড়ে সংগঠনের ব্যাপ্তি অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কারিগর। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবাংলার কর্মচারী সমাজের মুখপত্র তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার" পত্রিকা।

পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারেই রাজ্যের সামগ্রিক কর্মচারী সমাজ আরও বিকশিত ও বৃহত্তর আন্দোলন মঞ্চের ব্যাপ্তির পরিসরে ১৯৬৬ সালে গড়ে ওঠে ১২ জুলাই কমিটি; বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্র সহ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যাঙ্ক, বীমা, রাষ্ট্রায়াত্ত ক্ষেত্র, বিভিন্ন মার্কেন্টাইল সংস্থা ইত্যাদি সমস্তক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক আক্রমণ তীব্রতর হতে সুরু করলে তখন প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের জরুরী চাহিদাকে সামনে রেখেই সৃষ্টি হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌথমঞ্চ '১২ জুলাই কমিটি'। তৎকালীন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্র জুড়ে পুরোভাগে ছিলেন একদিকে যেমন কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, নরেন গুপ্ত, সুকোমল সেন ও কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যদিকে কে.জি.বসু, দীপেন ঘোষ, শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং সংগে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী। কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় এই সব সংগঠন গড়ে তোলা ও তার প্রসার ঘটানোর কাজে অন্যতম অগ্রণী সহযোদ্ধা ছিলেন এঁদেরই। পরবর্তী পর্বে তৈরী হল সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন। অজয়দা এই সংগঠনের প্রথমে অন্যতম সহ-সভাপতি, পরে আনারারী প্রেসিডেন্ট হন। তিনি সমস্ত দেশের সরকারী কর্মচারীদের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং এই সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ, ফিলিপাইন্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কিউবা প্রভৃতি দেশে যান।

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ ঘটে ১৯৮৯ সালে। তাঁর সংগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে পরপর ৪ (চার) বার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বামপন্থী সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। সংসদে শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে বারবার সোচ্চার হয়েছেন। বিশেষ উল্লেখ্য পেনশন ব্যবস্থা বেসরকারীকরনের বিরুদ্ধে সংসদে তার সোচ্চার হওয়ার ভূমিকা।

কর্মচারী সমাজ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের দাবীতে সোচ্চার হওয়ার সূত্রে তিনি শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মুখে পড়েন। একাধিকবার বাসস্থান এলাকায় এবং কর্মক্ষেত্রে বারংবার তাকে আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। রাজ্য কর্মচারীদের ১৯৭০ সালে তিন দিনের ধর্মঘট ছিল কর্মচারী আন্দোলনের অবিস্মরনীয় অধ্যায়, অজয়দা তখন অগ্রনী নেতৃত্ব, এই কারণে অজয় মুখোপাধ্যায় সহ ১২ জন নেতৃত্বকে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারা মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। শেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উক্তসকল বরখাস্ত কর্মচারীগণ চাকুরীতে পুনর্বহাল হন। অকুতোভয়, ঋজু ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি সমগ্র আক্রমনকে প্রতিরুদ্ধ করেই কর্মচারী আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ক্ষুরধার বক্তা অজয়দা সংগ্রাম আন্দোলনের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন, বক্তব্যের বাঁধুনি এমন নিরেট থাকত যে সেটি হুবহু অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করতে পারলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হয়ে প্রকাশ পেত। সময়োপযোগী শ্লোগান তৈরী করতে তার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ১৯৬০ সালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কর্মচারী অবস্থানে তিনিই শ্লোগান বাঁধলেন "আমরা দেশের সেবক গোলাম নই"। অনেকে বলেন তখন অধিস্তন রাজ্য কর্মচারীদের কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোন আর্জি জানিয়ে দরখাস্তের শেষে ব্রিটিশ পরাধীনতার গ্লানি মাখানো শব্দবন্ধ

'Your most obidient servant' লেখার যে চল ছিল তা ঐ স্লোগানের দৃপ্ত ঘোষণার মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ অপসৃয়মান হয় এবং শেষ পর্যন্ত 'Yours faithfully' বা Yours sincerely' তে রূপান্তর ঘটে। এসব এখন ইতিহাস।

তাঁর শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি ছিল আকর্ষনীয়। নাট্যকার হিসাবে তিনি একদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমি' কবিতার নাট্যরূপ লেখেন এবং তা অভিনীত হয়।

এই কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের সংগে আমাদের সংগঠন ও তার নেতৃত্ব ও অনুগামীদের সংগে সম্পর্ক প্রায় চার দশককাল ব্যাপি একেবারে শুরুর দিকে, ১৯৭৪ সালের পরবর্তী দশক আর্থসামাজিক পরিস্থিতির টালমাটাল অবস্থা, ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা এরই মাঝে আমাদের ১৯৭৪-৭৫ এ ১১০০ জন 'কানুনগো-গ্রেড-১ পদে (প্রথমে ৮১১ পরে আরও প্রায় ৩০০ জন) নিয়োগ হল। শুরু হয় ক্যাডার আন্দোলনের পরিসরে নতুন ধারা, এই আন্দোলনের পথেই আমাদের পরিচিতি ও সান্নিধ্য কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের সংগে। ROPA' 81, চালুর পূর্বে ৫০ টাকা প্রাপ্তি, PSC — মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল থেকে আমাদের ক্যাডারের নিয়োগ প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু করে পরবর্তী প্রায় সমস্ত ক্যাডারগত দাবী অর্জনের পথে অজয়দার পরামর্শ ও সহযোগিতা ছিল আমাদের সংগঠনের প্রেরণা। আবার ক্যাডার ঐক্য বিনষ্টকারী সংকীর্ণ স্বার্থন্বেষীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিশা দেখাতে আমরা সর্বদাই যার পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়ে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছি তিনিও কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়।

সমিতির নবরূপায়ণ ঘটছে ২৩ শে মে ১৯৮৭ র কনভেনশনে, ক্যাডার স্বার্থকে সুরক্ষিত করে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পই ছিল সে দিন মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। সেদিন অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের উক্ত কনভেনশনের প্রধান অতিথি। তিনি সেদিন বলেছিলেন মনে রাখতে হবে "এই শোষণমূলক আর্থসামাজিক কাঠামোয় আপনার দাবী অর্জন তথা রুটি-রুজির লড়াই-এর পথে কর্মচারীরাই আপনার প্রকৃত মিত্র এবং গ্রামের ছিন্নবাস ক্ষেতমজুর গরীব কৃষক বর্গাদারগণই আপনার প্রকৃতবন্ধু। নীতি ও আদর্শহীন সংগঠন অচিরেই কাগুজে সাইনবোর্ড সংগঠনে পরিনত হয়"। সেই শুরু তারপর সংগঠন-এর চলার পথে প্রতিটি বাঁক মোড়ে অজয়দার সুপরামর্শ আমাদের পাথেয় হয়েছে, এখানে অজয় দা শুধু ব্যক্তি নন এখানে অজয়দার ভূমিকা ছিল সংগঠকের যার পেছনে আছে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তিনি আমাদের ১ম রাজ্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি রূপেও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বুঝিয়েছিলেন তাঁবেদারি করে ব্যক্তিগত বা সাময়িক কিছু মানুষের সুবিধা এই প্রশাসনের কাছ থেকে অনুগ্রহ রূপে প্রাপ্তি ঘটতে পারে কিন্তু কর্মচারী সমাজের দাবী অর্জন,. মর্যাদা রক্ষা নির্ভর করবে কত বেশী মানুষকে উক্ত দাবী আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করা যায়তার উপর। তাই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ যেমন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সেই' ঐক্য আরও প্রসারিত হয়েছে রাজ্যে '১২ই জুলাই কমিটি'র পতাকাতলে, এবং সমগ্র দেশের সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ তৈরী হয়েছে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পতাকাতলে। আমরা তাই ২৩ শে মে, ৮৭ কনভেনশন থেকেই আমাদের অভীপ্সা ব্যক্ত করেছিলাম ঐ সব মঞ্চের সংগ্রামের সমর্থকও সাথী হওয়ার। তার গৌরবও সুফল আমরা ক্যাডার হিসাবে যেমন উপলব্ধি করেছি তেমনি অন্যান্য কর্মচারীদের সংগে সাফল্যেরও অংশীদারত্বের গৌরবও অর্জন করেছি।

অজয়দা এরপর আমাদের ৭ম ও ৯ম রাজ্য সম্মেলনেও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, ১৯৯৫ সালে আমাদের সমিতির নিজস্ব দপ্তর ক্রয় করা হল মৌলালী প্লাজা ভবনে যার দ্বারোদঘাটনও করেন কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়; শুধু সংগ্রাম আন্দোলনই নয় সঠিক দাবী সনদ রচনা করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাস্তব অবস্থান ও দুর লক্ষ্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য এই দুই এর মেলবন্ধন যে জরুরী তাও বুঝেছিলাম অজয়দার সান্নিধ্যে এসেই। তাঁর কাছে বড় শিক্ষা-কর্মচারী আন্দোলনে বিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই গুরুত্ব ও তার তাৎপর্য। তিনি বলতেন বিভেদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমস্যা নয় বিভেদপন্থা একটা প্রক্রিয়া যা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী কর্মচারী ঐক্য ভাঙতে ব্যবহার করে। তাই বিভেদপন্থায় আক্রান্ত কর্মচারী বা ক্যাডার বন্ধুকে বিপদের দিকটি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে হবে, তাকে ঐ প্রক্রিয়া থেকে টেনে তুলে আনতে হবে আমাদেরই। জলে ডুবন্ত মানুষকে যেমন শেষ পর্যন্ত চুলের মুঠি ধরে হলেও বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয় ঠিক তেমনি। শেষ পর্যন্ত না পারলে তাকে ডুবিয়েই ছেড়ে দিতে হয় নতুবা সে উদ্ধারকারী সহ ডুবে মরবে। বিভেদের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধে অজয়দাকে অনেক কটূক্তি ও গালমন্দ ও শুনতে হয়েছে। হাসিমুখে ঐসব তিনি অগ্রাহ্য করেই এগিয়েছেন দীর্ঘ ছয় দশকের সংগ্রামী জীবন। তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক সাবলীল উদাহরণ কমরেড অজয়দার জীবনের চলারপথ। সংগঠনের সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যা নির্ভয়ে বলা যেত আর যতটুকু সম্ভব সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে আশ্বস্ত করতে কোন দ্বিধা করতে দেখেনি। অনেকবার তার বাড়ীতেও আমাদের যেতে হয়েছে। সহজ সরল জীবনধারা, সদাহাস্যময় এবং প্রেরণাদায়ী। আজ অজয় মুখোপাধ্যায় তথা আমাদের প্রিয় অজয় দা নেই। কিন্তু রেখে গেছেন কর্মচারী আন্দোলনের অমূল্য মর্মবস্তুর সংগে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ যন্ত্রনার নিরসনে সংগ্রামের সমন্বয়ের পতাকা। যত বাধা বিঘ্নই আসুক সেই পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অটুট থেকেই অজয়দার অমলিন স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদিত হোক।

সবশেষে বলি, অজয় দা ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে গভীর আস্থাশীল, শোষনহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়েই জীবনের চলার পথকে বেছে নিয়েছিলেন সে পথের প্রতিবন্ধতা ব্যাপক কিন্তু তাঁকে হয় করতেই তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই অদয়দারা বেঁচে থাকেন সকল মানুকের মধ্যে যারা মাঠে ময়দানে অফিসে আদালতে সংগ্রামে রত।

আজ যখন ২০১৯ সালের শেষ লগ্নে এসে এই সব লড়াই সংগ্রাম সংগঠনের কথা স্মৃতিচারণ করছি তখন মানতেই হচ্ছে একটা প্রজন্মগত সময়ের ব্যবধান তৈরী হয়েছে। আজকের নতুন প্রজন্ম-এর কর্মচারীদের কাছে তাই উক্ত সংগ্রাম মুখরিত দিনের কথা আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, পুত্রদ্বয় সহ পরিবারের সকল সদস্যদের আমাদের সমবেদনা জানাই।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় অমররহে।

কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় লালসেলাম।

প্রতিবেদক — মনোরঞ্জন চৌধুরী

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে —

- প্রবীণ চিত্রশিল্পী — **রবীন মন্ডল**
- স্বনামধন্য ভাস্কর — **বিপিন গোস্বামী**
- বাংলার অন্যতম কিংবদন্তি ক্রিকেটার — **সৌমেন কুন্ডু**
- দিল্লীর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেত্রী — **শীলা দীক্ষিত**
- বাংলা থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের খ্যাতকীর্তি অভিনেতা — **স্বরূপ দত্ত**
- প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক — **জে ওমপ্রকাশ**
- দেশের প্রাক্তণ বিদেশমন্ত্রী — **সুষমা স্বরাজ**
- ভারতের প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রী, প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও ক্রীড়া প্রশাসক — **অরুণ জেটলি**
- চীনের প্রাক্তণ রাষ্ট্রপ্রধান — **লি পেঙ**

প্রমুখ দেশে ও বিদেশের স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী ব্যক্তিবর্গের।

উত্তর ২৪ পরগণার কচুয়ায় একটি ধর্মীয় সমাবেশে পদপিষ্ট হয়ে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দুর্ঘটনার বলি হয়ে, দেশে-বিদেশে উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসের কার্যকলাপে এই কালপর্বে বহু মানুষ অকালপ্রয়াত হয়েছেন।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

সপ্তদশ
(দ্বি-বার্ষিক)

রাজ্য সম্মেলন

সফল করার লক্ষ্যে

'সংগঠন - সম্মেলন তহবিল' সংগ্রহ অভিযানসহ রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলুন।

১১-১২ই জানুয়ারি, ২০২০ • শিলিগুড়ি

কেন্দ্রীয় কমিটি

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল

আর.ও, এস.আর.ও-২, এস.আর.ও-১দের অর্জিত অধিকার
রক্ষা, অপূরিত ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে

কেন্দ্রীয় হলসভা
ও
দাবী প্রস্তাব গ্রহণ

৩১শে আগষ্ট, ২০১৯, সকাল ১০টা

মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা

'পথে এবার নামো সাথী.....'

কেন্দ্রীয় কমিটি

সম্পাদক : অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে : ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯